স্বপ্ন-সম্ভব

স্বপ্ন-সম্ভব

ব ন ফু ল



রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৫৩

মূল্য তিন টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১২—১১. ৩. ৪৭

শ্রীমান সৌরেন বসু

কল্যাণীয়েষু

আমাদের স্বপ্ন যদি কোনও দিন সম্ভব হয়, তা হ'লে তা তোমাদের মত আদর্শনিষ্ঠ কর্মীর জন্যেই হবে। আমার এই ক্ষুদ্র কাব্য যদি তোমার কর্মে প্রেরণা যোগাতে পারে তা হ'লে আনন্দিত হব।

ভাগলপুর
শ্রীপঞ্চমী, ১৩৫৩

বলাইদা

যতীন কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রতিদিন খবরের কাগজ আর সে পড়িতে পারিতেছিল না। সেদিনকার কাগজটা নামাইয়া রাখিল। মনে হইল, মনুষ্যত্ব অবলুপ্ত হইয়া গেল নাকি! এই বিংশ শতাব্দীতে সমস্ত দেশ জুড়িয়া মানুষেরা যাহা করিতেছে, তাহাতে পিশাচেরাও যে লজ্জা পায়! হিন্দু আর মুসলমান··· অনেক কথাই মনে হইতেছে। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এই হিন্দু-মুসলমান এক ছিল। নানাসাহেবের প্রধান সহকারী ছিলেন আজিমুল্লা খান। বেরেলির বাহাদুর খান ঘোষণা করিয়াছিলেন, আমরা কোরবানি বন্ধ করিয়া দিব। দিল্লীর সম্রাট গো-হত্যা বন্ধ করিবার হুকুম দিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি যুদ্ধ করিয়াছিল। প্রত্যেক বিদ্রোহী বাহিনীতে মৌলভী ছিলেন, পুরোহিতও ছিলেন। মুসলমানের মহরমে হিন্দুরা যোগ দিতেন, হিন্দুর হোলিতে মুসলমানের অংশ গ্রহণ করিতে বাধিত না। দেখিতে দেখিতে কি হইয়া গেল! ইংরেজ-শাসনের মহিমায় মুসলমান সহসা আজ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা পৃথক 'নেশন'। সব মুসলমানেরা হয় নাই, নিরক্ষর অসহায় কৃষকের দল বোঝেও না, 'নেশন' বলিতে কি বুঝায়। যতীনের কয়েকটা ছবি মনে পড়িল। পলাশীর প্রান্তর, ক্লাইব ও মীরজাফর। উভয়ে উভয়ের পরম বন্ধু। তাহার ঠিক এক শত বৎসর পরে সিপাহী-বিদ্রোহের অবসানে ক্যাপ্টেন রবার্ট্‌স্‌ লিখিতেছেন, পাজি মুসলমানদের ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও যে, ইংরেজরাই এ দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা। নবাবেরা ফাঁসিকাঠে ঝুলিতেছেন। শাহাজাদাদের সারি সারি দাঁড় করাইয়া গুলি করা হইতেছে। ফতেপুরের পাঠান-বস্তি আক্রান্ত, ব্রিটিশের গুলিতে দলে দলে নিরীহ মুসলমান মরিতেছে, ব্রিটিশ সৈন্য দুই হাতে মুসলমানের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতেছে। নির্বাসনে দিল্লীর বাদশাহ ভাঙা খাটিয়ায় শুইয়া অন্তিম নিশ্বাস ফেলিতেছেন।

...তাহার পর এক শত বৎসর এখনও অতীত হয় নাই, ইংরেজের সঙ্গে মুসলমানের বন্ধুত্ব আবার জমিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ এখন মুসলমান মাইনরিটির স্বার্থরক্ষা করিতে ব্যাকুল। মুসলমানের দুঃখে চার্চিলের চক্ষে নিদ্রা নাই! কিন্তু দেশের সকলে এ কথা জানে না, এ কথার তাৎপর্য কে তাহাদের বুঝাইয়া বলিবে? এখানেও নাকি দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। বাতাসে বিষ সঞ্চারিত হইতেছে। সাধারণ মানুষ এ সবের প্রকৃত অর্থ জানে না। একটু আগে মেজদি আসিয়াছিলেন, দেশের কথা ভাবিবার সামর্থ্যই তাঁহার নাই। নিজের অতি-তুচ্ছ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার তুচ্ছতম খুঁটিনাটিই তাঁহার নিকট একমাত্র সত্য। নিজের কথাই সাতকাহন বলিলেন। তাঁহার অনেক দুঃখ। যতীনের মনে হইল, আমার দুঃখও কিছু কম নয়। মেজদি নিজের দুঃখের কথা পাঁচজনকে বলিয়া মনের ভার হালকা করিতে পারেন, আমি তাহা পারি না। আমার দুঃখের স্বরূপ কেহ বুঝিবে না। আমি যে স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিয়া তাহাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি, রূঢ় বাস্তবের আঘাতে তাহা বার বার ভাঙিয়া যাইতেছে বলিয়া যে কষ্ট পাইতেছি, তাহা কে বুঝিবে, কাহাকে বুঝাইব? মেজদির কথাগুলাই যতীনের মনে পড়িতে লাগিল। শুধু মেজদির নয়, মধ্যবিত্ত বাঙালী-জীবনের গ্লানিকর ছবির টুকরাগুলা আবর্জনার মত তাহার স্বপ্ন-লোককে ম্লান করিয়া তুলিতেছে। সে স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই সৃজন করিতে পারে না, কিন্তু বাস্তবের আঘাতে সে স্বপ্নও অক্ষুণ্ণ থাকিতে পাইতেছে না। হঠাৎ মনে পড়িল, সমর নোয়াখালি চলিয়া গিয়াছে। রুমিকে আজ দেখিতে আসিবে। রুমির এখনও বিবাহ হয় নাই বলিয়া সেজদার চিন্তার অন্ত নাই। বহু চেষ্টা করিয়া তিনি একটা পাত্র জুটাইয়া আনিয়াছেন। এখানেও দাঙ্গা বাধিবে নাকি? সহসা তাহার বাল্যবন্ধু মহীউদ্দিনের কথা মনে পড়িল। সেও কি বিশ্বাস করে, সে আলাদা 'নেশন'? মেজদি বলিতেছিলেন, মহীউদ্দিনের বউটি নাকি ভারি লক্ষ্মী। মেজদি সকলের খবর রাখেন। নিজের

পাড়ার তো বটেই, অপর পাড়ারও। কাহার বউ কবে পলাইয়া গিয়াছে, কোন্ মেয়ে বুড়া বাপকে আলুভাতে ভাত খাওয়াইয়া আপিসে বিদায় করিয়া দিয়া দুপুরে বন্ধুবান্ধব ডাকিয়া বাড়িতে আড্ডা জমায়, কাহার ছেলে চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে, কে কাহার গরুকে খোঁয়াড়ে পাঠাইয়াছে, কুকুর-কামড়ানোর ভাল দৈব ঔষধ কাহার জানা আছে··· যতীনের স্বপ্নলোকে আবার মেজদি ঢুকিয়া পড়িলেন। যতীন প্রাণপণে তবু মনটাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিল।

ভাবিতে লাগিল, আমি এখন যে জগতে আছি, যে জগতে থাকিতে চাই, সেখানে মেজদির এই সব কথা অতিশয় বেমানান। অথচ সকলের চক্ষে মেজদিই বাস্তব, আমার চক্ষেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিলেন, কিন্তু এখন মনে হইতেছে ঠিক উল্টা, মেজদিই অবাস্তব অস্বাভাবিক। ওই সদ্য-ফোটা অপরাজিতার পাপড়িতে বসিয়া যে নীল পরীটা দোল খাইতেছিল, যাহার অতি সূক্ষ্ম ওড়নাখানা প্রচ্ছন্ন কম্পনে নীল পরীর মনের ইঙ্গিতময় ভাব প্রকাশ করিতেছিল, আমার চোখে এখন ওই নীল পরীটাই বাস্তব, মেজদি নয়। নীল পরীর অতি-সূক্ষ্ম ওড়নাখানাকে বাস্তববাদীরা মাকড়সার জাল বলিয়া ভুল করিবে। পরীরা যে ওড়না কাঁপাইয়া মনের কথা প্রকাশ করে, এ কথাও কেহ বিশ্বাস করিবে না জানি ; কিন্তু ইহা সত্য। যে সোনার নৌকায় চড়িয়া নীল পরী অপরাজিতার সবুজ কুঞ্জে ভিড়িয়াছে, সেই সোনার নৌকাটাই এ জগতে মানায় ভাল ; মেজদির নাকী সুরের কান্নাটা নয়। নৌকাখানাই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছিলাম। সোনার অথচ স্বচ্ছ, ক্ষণে ক্ষণে আকৃতি পরিবর্তন করে। একটু আগেই ঠিক নৌকার মত ছিল, কিন্তু যেই আমি লক্ষ্য করিতে শুরু করিয়াছি অমনই টের পাইয়া গিয়াছে, আত্মগোপন করিতে চায়, দেখিতে দেখিতে লম্বা রেখার মত হইয়া গেল। আমার কাছে এখন কিন্তু লুকানো শক্ত। অপরাজিতার পাপড়িতে দোল খাইতে খাইতে ওড়না কাঁপাইয়া নীল পরী ইঙ্গিতে সব কথা আমার কাছে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। এখন আর আমাকে

ফাঁকি দেওয়া চলিবে না। নীল পরী এখন আমার পক্ষে। আগে যখন বাস্তববাদী ছিলাম, তখন আমিও ওটাকে এক টুকরা রোদ বলিয়া জানিতাম। এখন বুঝিয়াছি, সেটা ভুল। আসলে ওটা সোনার তরী, নীল পরী উহাতে চড়িয়া পাড়ি দেয় অরূপলোক হইতে রূপলোকে, সত্য হইতে স্বপ্নে, অসীম আকাশে অদৃশ্য তরঙ্গের শিখরে শিখরে। আর আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা আশ্বাসজনক ঘটনা—নীল পরী ইঙ্গিতে আমাকে জানাইয়াছে, অপ্রত্যাশিত পথে সে একদিন আসিবে, আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবে, লইয়া যাইবে সেই রহস্যলোকে—যেখানে জ্যোৎস্না ফুল হইয়া ফোটে, ফুলেরা প্রজাপতির মত উড়িয়া বেড়ায়, যেখানে সমস্ত সৌন্দর্যের উৎসমুখে চাপা আছে একটি রহস্যময় মণি—যে মণি কেহ খুলিতে পারে না, যাহা আপনি মাঝে মাঝে একটু একটু করিয়া খোলে আর নব নব সৌন্দর্যের প্লাবনে নিখিল বিশ্ব ভরিয়া যায়। ঠিক তাহার পাশেই পাতালপুরীর সুড়ঙ্গ আছে, অদ্ভুত অন্ধকার সুড়ঙ্গ, কোথায় কতদূরে চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না—অতল অশেষ। এই সব কথা নীল পরী আমাকে বলিয়াছে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার—নীল পরী নীলও নয়, পরীও নয়। আজ নীল পরী সাজিয়া আসিয়াছে, কাল আসিয়াছিল কাঠঠোকরার বেশে—মাথায় ঝুঁটি, লম্বা সরু ঠোঁট, গলার কাছটা বাদামী রঙের, পিঠে ডানায় সাদা-কালো ডোরা ডোরা, ক্ষণে ক্ষণে মাথার ঝুঁটিটা ফর্‌র্ করিয়া খুলিয়া যায়। ওই যে ভ্রমর, ওই যে টিকটিকি—উহারাও হয়তো নীল পরীর ছদ্মরূপ। যে বেশেই আসুক, আমি উহাকে চিনি, উহাকে ঘিরিয়াই নূতন জগৎ গড়িয়াছি, সেই জগৎটাই আমার কাছে সত্য, মেজদি নয়।··· আবার মেজদি আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মূর্তিটা আবার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতেছে, তাঁহার কথা শুনিতে পাইতেছি।

আজ একটু চলতে গেলেই হাঁপ ধরছে বড্ড, বুকের ভেতরটা ধকধক করছে, হাতুড়ি দিয়ে পিটছে যেন কেউ। আর এই বাঁ দিকের শিরটা এমন্ টেনে ধরেছে, যেন বঁড়শিতে গেঁথেছে। লোকের কাছে

না ব'লেও পারি না, সবার কাছে বলতে আবার লজ্জাও করে, সবাই বিশ্বাস করবে কেন, নিজের ঘরের লোকই করে না।...

মেজদি নাকটা ঈষৎ কুঁচকাইয়া চশমাটা ঠিক করিয়া লইলেন। এটি তাঁহার মুদ্রাদোষ। চশমা ঠিক করিয়া আবার শুরু করিলেন—

উনি মনে করেন, বুড়ো মাগীর হিস্টিরিয়া হয়েছে। হয়তো হিস্টিরিয়াই।—একটু হাসিলেন, তাহার পর একটু থামিয়া আবার বলিলেন, যে নামই দাও তোমরা, কষ্ট তো হয়। এই দেখ না, বাঁ দিকের রগটা সমানে দপদপ ক'রে চলেছে, অথচ হাত দিয়ে দেখ ঠাণ্ডা হিম, সমস্ত বাঁ অঙ্গটাই ঠাণ্ডা। আশ্চর্য, নয়? যখন যেদিকটার দপদপানি বাড়ে, অমনই সেদিকটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।...

মেজদির ফোকলা দাঁতের হাসি বড় মিষ্ট। কিন্তু এই মিষ্টতা এখন মনে আর সে মাধুর্য সঞ্চার করিতে পারে না, আগে যেমন করিত। এই মেজদির সঙ্গে আমাদের কোন রক্তের সম্পর্ক নাই। উনি পাড়ার সকলেরই মেজদি। ছেলেবেলায় এই মেজদির কাছে কত আগ্রহে কত রূপকথাই না শুনিয়াছি! কিরণমালার গল্পটা কত রঙে রাঙাইয়াই না বলিয়াছিলেন, এখনও একটু একটু মনে পড়ে। এখন মেজদিকে একটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। সবুজ ক্ষেতের মাঝখানে কিম্ভূতকিমাকার কি একটা যেন! খড়ের তৈয়ারি দেহ, লম্বা হাত পা, গায়ে বেমানান একটা জামা, মাথায় কালো হাঁড়ি, তাহার উপর চুন দিয়া চোখ মুখ নাক আঁকা। পাখিরা দেখিয়া ভয় পায়। শুধু মেজদি নয়, সকলেরই এই অবস্থা। হাসি পায়, দুঃখও হয়। আর একটা কথা ভাবিয়া আশ্চর্যও লাগে। বাড়ির মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ আমি—আমার চেয়েও ছোট অবশ্য আছে একজন, আমাদের একমাত্র ছোট বোন রুমি —কিন্তু আমিই কেবল দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছি। আমিই কেবল বুঝিয়াছি, বাহিরের এই এত বাহ্যাড়ম্বর, এই দেশব্যাপী দাঙ্গা, কলহ, রুমির রোমান্স, বড়দার আভিজাত্য, মেজদার অহঙ্কার, সেজদার 'ঠাকুর-ঘর, পাড়ার শৈলেনদার কমিউনিজ্‌ম প্রতিটি লোকের নানা আজগুবি

আচরণ, যাহা বাস্তববাদীদের বিচারে বাস্তবিক, বস্তুত তাহার প্রত্যেকটিই অলীক। বাস্তবিক কেবল নীল পরী—যে নীল নয়, পরী নয়, যে যখন-যেমন-খুশি-বেশে দেখা দিতে পারে এবং দেয়।

কিন্তু মেজদিরা থামিবেন না··· আবার মেজদির কথাগুলা শুনিতে পাইতেছি।

পাশের ঘরে ভোর থেকে লুচি ভাজা হচ্ছে, পেঁয়াজ ভাজা হচ্ছে, চা হচ্ছে, গন্ধ পাচ্ছি ; কিন্তু বেল পাকলে কাকের কি বল, আমি আমার ঘুঁটের উনুন ধরিয়ে চাটুকু ক'রে নিলাম। চা করতে গিয়ে দেখি, চিনি নেই। তোমার বউদি কাল যে লক্ষ্মীপুজোর বাতাসা প্রসাদ দিয়েছিল, তাই ছিল দুখানা—তাই দিয়েই করলাম, বেশ লাগল।···

মেজদি আবার হাসিলেন। আবার নাক কুঁচকাইয়া চশমাটা ঠিক করিয়া লইলেন। ভাবিয়াছিলাম, প্রত্যুত্তর না করিলে মেজদি বুঝি চলিয়া যাইবেন। কিন্তু মেজদি প্রত্যাশাভরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিতে হইল, চিনির অভাবে বাতাসা দিয়ে চা খেতে হ'ল ? চিনি আনিয়ে রাখেন নি কেন ? কন্‌ট্রোলে তো চিনি দিচ্ছে আজকাল।

তা তো দিচ্ছে। আমাকে কে আর এনে দেবে, বল ? নিজেকে গিয়েই তো আনতে হবে দোকান থেকে। যা ভিড়, দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ফিরে এলাম কাল।

কেন আপনার নাতিরা ?

নাতিরা ! তবেই হয়েছে। কি বললে জান আমার বড় নাতি ? আমাদের কল থেকে জল নিও না, বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে বুড়ী ডাইনী—এই সব কথা ভদ্দরলোকের ছেলেরা বলে কখনও তার ঠাকুমাকে ? শুনেছ কখনও ? ঘরের কথা কত আর বলি ! ছেলে এই সব বলছে, আর তার মা ফিকফিক ক'রে হাসছে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে। দেখেছ কখনও এমন কাণ্ড ?

মেজদির কথায় বিস্ময় খেদ ব্যঙ্গ যুগপৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ঘোষাল মশায়ের উচিত নাতিদের শাসন করা।

তা করলে ভাবনা কি ছিল, উনি কিছু বলবেন না।

ইহার পরই মেজদির সুর বদলাইয়া গেল। ঘোষাল মশায়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া তিনি ওকালতি শুরু করিলেন।

কি ক'রেই বা বলবেন বল ভাই। শোকাতাপা মানুষ। বুড়ো বয়সে অত বড় ঘা খাবার পর কি আর শাসন করতে ইচ্ছে হয় কাউকে...

মেজদি ঘাড় ফিরাইয়া বোধ হয় উদ্গত অশ্রুটাই গোপন করিতে চাহিলেন। পুত্রশোকে অশ্রুপাত করা এমন কিছু লজ্জাজনক ব্যাপার নয়, কিন্তু মেজদি কিছুদিন হইতে অশ্রুটা গোপন করিতেছেন, কেন জানি না। বোধ হয় লোকের সহানুভূতি এড়াইবার জন্য। লোকের সহানুভূতি অনেক সময় বড় কষ্টদায়ক। কিছুদিন পূর্বে মেজদির উপযুক্ত পুত্রটি মারা গিয়াছে। বড় চাকরি করিত। বিধবা পুত্রবধূ এবং তাহার একপাল ছেলেমেয়ে লইয়া প্রদ্যোত ঘোষাল বৃদ্ধবয়সে সত্যই বড় বিপন্ন। তিনি নাতি-নাতনীদের শাসন করিতে পারেন না। পুত্রবধূকে কিছু বলা তাঁহার পক্ষে নাকি আরও কঠিন। তাহার বিধবা-মূর্তি দেখিলেই তিনি এমন অবসন্ন হইয়া পড়েন যে, তাহাকে কিছুই বলিতে পারেন না। তাহার সমস্ত আবদার সহ্য করিতে হয়। সে শাশুড়ীকে অপমান করে, ডাইনী বলে, তাঁহাকে আলাদা হেঁসেল করিতে হইয়াছে, তাহার বাক্যের জ্বালায় মেজদির বাড়িতে টেঁকাও দুষ্কর, পথে পথে তিনি ঘুরিয়া বেড়ান, পাড়ার লোকে বলে—বউটা বিধবা হইয়া যেন সকলের মাথা কিনিয়াছে। ঘোষাল মহাশয় কিন্তু চুপ করিয়া থাকেন। প্রাণ ধরিয়া কিছু বলিতে পারেন না। শুধু তাই নয়, যাহা কিছু উপার্জন করেন সব ওই পুত্রবধূকেই আনিয়া দেন। মেজদিকে বলেন, পয়সা নেড়ে-চেড়ে তবু যদি ভুলে থাকে থাক্—আহা!

ইহার পর মেজদি যে প্রসঙ্গটি তুলিয়াছিলেন, তাহা প্রবলভাবে

যতীনের আবার মনে পড়িয়া গেল। যাইবার পূর্বে মেজদি বলিয়া গেলেন, যাই নীলিদের বাড়ি, দেখি সেখানে কতদূর কি হ'ল, আত্মীয়-স্বজনরা তো কেউ আসবে না শুনছি। তুমি যাবে তো ?···

আজ নীলার বিয়ে। সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া নীলা পাড়ার একটি বয়াটে ছোকরা প্রবালকে বিবাহ করিতেছে। আত্মীয়-স্বজনরা এতদিন নীলার সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, কেহ তাহার সুশিক্ষার বা বিবাহের ব্যবস্থা করেন নাই, সকলের সঙ্গে যথেচ্ছ মিশিবার অবারিত সুযোগও দিয়াছিলেন। এখন সকলের মনে ধর্মভাব জাগিয়াছে। সগোত্রে বিবাহ তাঁহারা কিছুতেই হইতে দিবেন না। অতি-দূর-সম্পর্কের বিনয়বাবু বর্মা হইতে প্রচুর অর্থোপার্জন করিয়া ভাগ্যে কিছুদিন পূর্বে ফিরিয়াছেন, তিনিই দাঁড়াইয়া বিবাহ দেওয়াইবেন। তাঁহার মতে ভ্রূণ-হত্যা করাটা বোকামি। বাঙালী হিন্দুরা যে জীবন-যুদ্ধে হটিয়া যাইতেছে, তাহার একটা কারণ—তাঁহার মতে—ভদ্র হিন্দুরা ক্রমশ সংখ্যায় কমিয়া যাইতেছে। সংখ্যা বাড়িবে কি করিয়া ? অধিকাংশ ভদ্র হিন্দু-নারীর জীবনই নিষ্ফল। যে সব শিক্ষিত ভদ্রলোক সমাজকে জীবনযুদ্ধের উপযোগী সমর্থ সন্তান দিতে পারেন, বিলাস ও স্বার্থপরতার কবলে পড়িয়া তাঁহারা বিলাতী উপায়ে জন্মনিরোধ করিতেছেন, কুমারীদের বিবাহ হইতেছে না, বিধবারা তো আছেই। ইহাদের মধ্যে দুই-একটা যদি জীবনের প্রাবল্যে সমাজের বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া ফলবতী হইতে চায়, মন্দ কি ? বিনয়বাবুর ইহাই মত। নীলাকে তিনি সাহায্য করিবেন। আজই বিবাহ। যতীন নীলার কথাই ভাবিতে লাগিল—মনের কি অদ্ভুত ক্ষমতা ! কত দিনের ঘটনা দুই মিনিটে ভাবিয়া ফেলিতে পারে। নীলা ! নীলার রাজরাণী হইবার যোগ্যতা ছিল, কিন্তু কাঙালিনীর মত সে সবার দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছে। আমার কাছেও আসিয়াছিল, আমিও তাহাকে লইয়া কবিতা লিখিয়াছি। শুধু আমি নয়, অনেকেই লিখিয়াছে। হয়তো বিনয়বাবুও। আমি শুধু কবিতা লিখিয়াই ক্ষান্ত

হই নাই, তাহাকে বিবাহ করিতেও চাহিয়াছিলাম। যদিও সে অন্য জাত, তবু বউদিদিদের দিয়া বাবার মত করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। বড় বউদিদি বাবাকে কাশীতে পত্র লিখিয়াছিলেন। বাবা মত দিলেন না। তবু আমি নীলাকে চাহিয়াছিলাম··· যাক সে কথা··· একটা কথাই কেবল মনে হইতেছে, শেষ পর্যন্ত প্রবালের মত ছেলেকে ফাঁদে ফেলিয়া নীলাকে মাতৃত্ব অর্জন করিতে হইল! জীবনের প্রবাহকে তো কেহ রোধ করিতে পারে না। তুমি যদি অস্বাভাবিক আইনের বাঁধ তুলিয়া তাহাকে আটকাইতে যাও, বারম্বার সে বাঁধ ভাঙিয়া যাইবে। মানুষ নিজেকে ভুলাইতে গিয়া একটা কথা ভুলিয়া যায়— প্রকৃতি কোন বঞ্চনাকেই কখনও প্রশ্রয় দেয় না। তাহার নিয়ম অমোঘ, পরিণাম অব্যর্থ। আত্মবঞ্চনা শেষ পর্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠে।··· আত্মবঞ্চনার কথায় নিভাননীর কথা মনে পড়িতেছে। বিধবা নিভাননী। বছর দশেকের একটি ছেলে লইয়া সে খুড়ার আশ্রয়ে থাকিত।..কিছুদিন পরে কানাঘুষা শোনা গেল, সে নাকি সন্তানসম্ভবা। সমস্ত চিহ্নও সর্বাঙ্গে ক্রমশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। নিভাননী নির্বিকার। নির্বিকার থাকিয়া কিন্তু লোকের মুখ বন্ধ করা যায় না। খুড়া মহাশয় বিচলিত হইলেন। খুড়ীমার মারফৎ সকলের সন্দেহটা নিভাননীর গোচর করিলেন। নিভাননী সোজা অস্বীকার করিল। বলিল, আমার পেটে মাংস বাড়িতেছে। কেন বাড়িতেছে, বলিতে পারি না। ডাক্তার ডাকা হইল। নিভাননী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই ডাক্তার ডাকাইল। ডাক্তার যখন সত্য কথা বলিলেন, তখন, নিভাননী হাসিয়া উঠিল। ডাক্তারের মুখের উপরই বলিল, আপনি কিছু জানেন না। খুড়া মহাশয় বিপন্ন হইলেন। তিনি ছাপোষা গৃহস্থ লোক। ঘরে কয়েকটি বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। একটা কেলেঙ্কারি হইয়া গেলে তিনি অকূল সমুদ্রে পড়িয়া যাইবেন। তিনি নিভাননীকে দূর করিয়া দিলেন। নিভাননী আমাদের বাড়ির পাশের গোয়াল-ঘরটাতে আসিয়া আশ্রয় লইল। কাঁদিতে কাঁদিতে নয়, হাসিতে হাসিতে। অবুঝ শিশুর অসঙ্গত

আচরণে বয়স্ক ব্যক্তি যে হাসি হাসে, নিভাননীর হাসিটা সেইরূপ। প্রথম হইতেই নিভাননী ব্যাপারটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল। কোন সমালোচনা, কোন গালাগালি গায়ে মাখে নাই। কেন সে এরূপ করিয়াছিল, জানি না। নিজেই সে সম্ভবত ব্যাপারটাকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার দশ বৎসরের ছেলে বিশুর পক্ষে ব্যাপারটা মর্মান্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রথমটা সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। মোটরে চড়িয়া বড় ডাক্তার আসিয়া ঘরে খিল বন্ধ করিয়া মাকে যখন পরীক্ষা করিয়া গেল, তখন সে অবাক হইল। মায়ের কি হইয়াছে ? সকলে বলিল, মায়ের অসুখ করিয়াছে। তাহার পর দাদু যখন মাকে দূর করিয়া দিলেন, মাকে একটা স্যাঁতসেঁতে প'ড়ো গোয়ালে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইল, তখন বিশু কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। মাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার অসুখ করেছে, তবু তোমায় দাদু তাড়িয়ে দিলে কেন মা ? নিভাননী উত্তর দিল, তোমার দাদুর মাথা খারাপ। তাঁহার কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল, তাহাতেই দিন চলিতে লাগিল। বিশু যেমন স্কুলে যাইতেছিল, যাইতে লাগিল। স্কুলেরই একটি ছেলে আসল কারণটা একদিন তাহার নিকট ব্যক্ত করিল। বলিল, তোর মাকে কেন তাড়িয়ে দিয়েছে জানিস ? তোর মায়ের ছেলে হবে। বিস্মিত বিশু স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিভাননীকে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা মা, অবুদা আজ বলছিল যে, তোমার নাকি ছেলে হবে, তাই দাদু তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ মা, সত্যি ? নিভাননী ছেলেকে ধমক দিল, না, মিছে কথা। ওসব ফাজিল ছেলের সঙ্গে মিশতে যাস কেন তুই ?··· যথাসময়ে নিভাননী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। পাড়ার লোকে দেখিতে আসিল। নিভাননীর লজ্জা নাই। সে যেন নিজেই সর্বাপেক্ষা বেশি বিস্মিত হইয়াছে। সকলের সমক্ষেই সে দুই হাত জোড় করিয়া সদ্যোজাত শিশুটাকে প্রণাম করিল। তাহার পর সকলকে বলিল, এঁকে তোমরাও প্রণাম কর, ইনি যীশুখ্রীষ্ট। পাড়ার লোকেরা মুচকি হাসিয়া গা-টেপাটেপি করিতে করিতে চলিয়া

গেল। নিভাননী আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া হয়তো আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু বিশু পারে নাই। একটা চিত্র মনে পড়িতেছে। স্কুলের সমস্ত ছেলেরা হাততালি দিতে দিতে সমস্বরে বলিতেছে, বিশুর মায়ের ছেলে হয়েছে—দুয়ো, দুয়ো···। বিপন্ন বিশু কোথায় যে মুখ লুকাইবে, ভাবিয়া পাইতেছে না। নিভাননী পাগল নয়, পাগল হয়ও নাই। কাশীতে গিয়া সে সুখেই বাস করিতেছে শুনিয়াছি।···

এই পর্যন্ত ভাবিয়া যতীনের সহসা মনে হইল, এমনভাবে একটানা ভাবিয়া চলিয়াছি কেন? যাহা ভাবিতেছি, কাগজ কলম লইয়া তাহা লিখিয়া ফেলিলেই তো হয়। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হইল, কত লিখিব? জীবনের প্রতি মুহূর্তে যাহা ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে এবং ঘটিবে, তাহার আলেখ্য আঁকিতে পারি, এত রঙ তো আমার নাই। এ নাটক যে মহা-নাটক! অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এ নাটকের দৃশ্যপট, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত সমস্ত কিছুই ইহার পাত্র-পাত্রী। ইহা কি লিখিয়া শেষ করা যায়?···

বিস্ফারিত নয়নে সে খোলা জানালার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। বিস্তৃত নীলাকাশে সাদা মেঘের অপরূপ আস্তরণ। ওখানে কি অভিনয় হইতেছে? কে উহারা!··· একটা অদৃশ্য নাটকের অদ্ভুত অভিনয় তাহার চোখের সম্মুখে মূর্ত হইতে লাগিল। এতক্ষণ বুঝিতে পারে নাই যে, সে নিজেও একজন অভিনেতা—অজ্ঞাতসারে অভিনয় করিতেছিল। এইবার সচেতনভাবে করিতে লাগিল।

গুনগুন করিয়া একটা ভ্রমর ঘরে ঢুকিল।

যতীন। এস নীল পরী।

ভ্রমর। [বিস্মিত] নীল পরী! সে আবার কি? এতকাল আমাকে ভ্রমর, অলি এই সব নামে ডাকতে, হঠাৎ আজ নূতন নাম কেন?

যতীন। পুরোনো জিনিস বড় একঘেয়ে। নূতন নাম দিয়ে পুরাতনকে আধুনিক করবার চেষ্টা করছি।

ভ্রমর। নাম বদলালেই আধুনিক হয় নাকি? আমার নাম বদলাবার দরকার নেই, আমি এমনিই আধুনিক, কতই বা আমার বয়স, একটিমাত্র বসন্ত তো উপভোগ করেছি।

বাহিরে কুড়ুরুক কুড়ুরুক শব্দে একটা পাখি ডাকিয়া উঠিল।

ভ্রমর। ওই শোন, আমাকে ডাকছে, আমি চললাম।

যতীন। প্রায়ই ওর ডাক শোনা যায়, কে বল তো?

ভ্রমর। পাখি।

যতীন। তা তো জানি। কি পাখি?

ভ্রমর। ওর বেশি আমিও জানি না। তোমরাই তো সবাইকে নাম দাও। তুমিই বল না, কি ওর নাম?

যতীন। ওর সঙ্গে তোমার খুব বন্ধুত্ব নাকি?

ভ্রমর। বন্ধুত্ব কাকে বল? ও কথারও মানে বুঝি না। তবে ওকে ভাল লাগে—ছোট্ট সবুজ পাখিটি, কিন্তু গলায় কেমন সুর!

যতীন। আলাপও নেই?

ভ্রমর। না।

যতীন। তবে যে বললে, ডাকছে তোমাকে।

ভ্রমর। (যা আমার ভাল লাগে, তাই আমাকে ডাকে, তার কাছেই আমি যাই।) আলাপ থাকবার দরকার কি! তোমরা কথা ব'লে বড় সময় নষ্ট কর।

ইলেক্‌ট্রিক সুইচের ব্র্যাকেটের আড়াল হইতে একটি টিকটিকি বাহির হইয়া আসিল এবং উদ্‌গ্রীব হইয়া উৎসুক দৃষ্টিতে ভ্রমরটির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল।

যতীন। আমরা কথা কই, তোমরা গুনগুন কর। হঠাৎ এলে কেন বল দেখি ?

ভ্রমর। তোমাদের খবর নিতে।

যতীন। কি খবর ?

ভ্রমর। তোমাকে দেখতে পেলাম, এই তো একটা খবর।

চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে লাগিল।

টিকটিকি। [নীরব ভাষায়, যতীনকে] ভোমরাটাকে কথায়-বার্তায় অন্যমনস্ক ক'রে আমার দিকটায় আনতে পার একটু যদি—

যতীন। কেন, কি করবে ?

টিকটিকি। খপ ক'রে ধরব, তারপর চিবিয়ে খাব।

তাহার টুকটুকে লাল জিবটা বার দুই বাহির করিল।

যতীন। [স্বগত] কি ভয়ানক ! [প্রকাশ্যে] ও আমার অতিথি, ওকে নাই বা খেলে।

টিকটিকি। আমিও তো তোমার অতিথি, আমার খাবার ব্যবস্থা কর তা হ'লে।

যতীন। আমার ঘরে এত জিনিস আছে, খাও না।

টিকটিকি। আমি পাঁউরুটিও খাই না, সিগারেটও খাই না, পোকা খাই। তোমার ঘরে কদিন থেকে আলো জ্বলছে না, পোকাও আসছে না, অনাহারে আছি।

ভ্রমর তাহার কথা শুনিতে পাইল কি না, বোঝা গেল না। অন্তত তদনুসারে সে কিছু করিল না। ঘরের চতুর্দিকে গুনগুন করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। তাকের উপর একটা 'টাইম্‌পিস' ছিল, সেইটাই

সম্ভবত তাহার কৌতূহল বেশি উদ্রিক্ত করিয়াছিল, সেইটাকেই সে বারম্বার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।

টিকটিকি। ভোমরার প্রতি তোমার যে বেশি পক্ষপাতিত্ব, তা আমি আগে থেকেই জানি। অতিথি-সৎকারের বড়াই করলে কিনা, তাই বাজিয়ে দেখলাম একবার।

যতীন। হ্যাঁ, সত্যিই তাই, কেন বল তো?

টিকটিকি। তোমাদের মতে ও যে সুন্দর, [সশ্লেষে] মানুষের বিশেষত্বই তো ওই। পক্ষপাতিত্ব। তারা সাম্যের ভান করে, কিন্তু কিছুতেই সম-দৃষ্টি হতে পারে না।

যতীন। তোমাদের কাছে সুন্দর কুৎসিত ব'লে কিছু নেই নাকি?

টিকটিকি। আমাদের কাছে যা প্রয়োজনীয়, তাই সুন্দর। ওই ভোমরাটা আমার চোখেও সুন্দর, কিন্তু খাদ্য-হিসাবে। আমার সঙ্গিনী—কোথায় গেল সে—তাকে দেখলে তুমি ঘৃণায় আঁতকে উঠবে। আমার চোখে কিন্তু সে রমণীয়। তোমার এই কাঠের ব্র্যাকেটটিও বেশ সুন্দর, এর ফাঁকে বেশ নিরাপদে ঘুমুতে পারি। প্রয়োজনের বাইরে তোমরা কেন যে আর এক দল সুন্দর কুৎসিত সৃষ্টি ক'রে অকারণ পক্ষপাতিত্ব কর, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

অশরীরী ফ্রয়েড প্রবেশ করিলেন।

অশরীরী ফ্রয়েড। মানুষের সৌন্দর্যবোধের মূলেও প্রজনন-স্পৃহা বর্তমান।

টিকটিকি। [সবিস্ময়ে] তাই নাকি?

যতীন। তা হ'লে টিকটিকির আমাদের মত সৌন্দর্যবোধ নেই কেন?

অশরীরী ফ্রয়েড। ওর প্রজনন-স্পৃহা লুকিয়ে রাখবার দরকার হয়

না। সভ্য মানুষই তা লুকিয়ে রাখে এবং রূপান্তরিত ক'রে প্রকাশ করে সেটা বহু বাসনায়, বহু ভঙ্গীতে, বহু বৈচিত্র্যে—কখনও জ্ঞাতসারে, কখনও অজ্ঞাতসারে।

যতীনের তর্ক করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু কিছু বলিবার পূর্বেই অশরীরী ফ্রয়েড অন্তর্হিত হইলেন। লোকটাকে কাঠখোট্টা বলিয়া মনে হইল। ভ্রমর উড়িয়া টিকটিকির সামনে আসিল এবং তাহার লোলুপ চোখের সামনে বেশ একটু দূরত্ব রক্ষা করিয়া বৃত্তাকারে ঘুরিতে লাগিল। ভাবটা যেন—ধর না দেখি, ধর না দেখি! মনে হইতে লাগিল, সে যেন যতীনের সহিত টিকটিকির কথাবার্তা সব শুনিয়াছে।

ভ্রমর। [যতীনকে] ভারি ভীতু লোক তো তুমি। কি ব'লে ওই ঘৃণ্য টিকটিকিটাকে আমার জন্যে অনুরোধ করলে! ওদের কি আমরা গ্রাহ্য করি নাকি?

যতীন। কর না?

ভ্রমর। বাঃ, দেখছ না, আমাদের ডানা আছে যে।

বাহিরে আবার কুড়ুরুক কুড়ুরুক শব্দ হইল।

ভ্রমর। আমি চললাম।

বোঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল। যতীনের মনে হইল, টিকটিকির দেহ হইতে একটা রক্তবর্ণ দন্তুর ছায়া ডানা মেলিয়া ভ্রমরের পশ্চাদ্ধাবন করিল। যতীন দেখিল, কায়াবান টিকটিকি বেশ হাসিমুখে বসিয়া আছে।

টিকটিকি। ডানার গুমরে কিন্তু একটা কথা ভুলে গেল বেচারী। ওই ডানা-ওয়ালাদেরই রোজ আমরা খাই।

যতীন। সেটা ওরা আলো দেখে তন্ময় হয়ে পড়ে ব'লে। ওতে তোমাদের কৃতিত্ব তেমন নেই।

টিকটিকি। তোমরা যখন আলো জ্বালতে শেখ নি, তখনও আমরা পোকা ধ'রেই খেতাম। অনাহারে থাকি নি কখনও। তবে তোমাদের আলোতে আমাদের সুবিধে হয়েছে তা অস্বীকার করছি না। আলো জ্বাললেই ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ে ওরা। আচ্ছা, আলো জ্বালছ না কেন আজকাল ?

যতীন। ডাক্তারের মানা। রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, তাই তিনি আলো জ্বালতে বারণ করেছেন।

টিকটিকি। এ আবার কি বেয়াড়া চিকিৎসা! আলো না জ্বেলে ঘুম হচ্ছে ?

যতীন। না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে যতীন চমকাইয়া উঠিল। ইলেক্‌ট্রিক টেবিল-ল্যাম্পটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে। শ্বেতপ্রস্তর-নির্মিতা নগ্না তরুণীটির দিকে যতীন সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। উত্থিত বাহুর উপর ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বটা দীপ্তিহীন ম্রিয়মাণ। তরুণীটির চোখের দৃষ্টিও বেদনাময়, কিন্তু অগ্নি-গর্ভ।

যতীন। তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে ?

প্রস্তর-তরুণী। হ্যাঁ।

যতীন। কেন ?

প্রস্তর-তরুণী। বাইরে থেকে মনে হয়, আমি তোমার রাতের অন্ধকারকে আলোকিত করবার ভূমিকায় অবতীর্ণ। কিন্তু আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমার উর্ধ্বোত্থিত বাহুতে যে প্রদীপ দিয়েছ, তা তোমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় জ্বলে নেবে। সুইচ তোমাদের হাতে। আমি সামান্য জড়, [সহসা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে] জড় ক'রে রেখেছ আমাকে।

যতীন। কে বললে, তুমি জড়? আমি জানি, তোমার দেহের প্রতি অণু-পরমাণুতে বহ্নিকণা আবর্তমান, তুমি নিজেকে জড় ব'লে ভাবছ কেন?

প্রস্তর-তরুণী। তোমার ভাষার ছটায় বহ্নিদীপ্তি আছে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের সম্বন্ধে যখন কথা বল তখন সেটা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তাও জানি। আমাদের মধ্যে যে বহ্নি আছে তা তোমাদেরই প্রদীপ্ত বর্ণনায় শুনেছি, নিজের মধ্যে তা অনুভব করবার সুযোগ দাও নি কখনও। রক্ষা করেছ, বন্দনা করেছ, দলিত করেছ, সত্যিকার স্বাধীনতা দাও নি।

টিকটিকি। ঠিক ঠিক ঠিক।

চতুর্দিক কেমন যেন ঝাপসা হইয়া আসিল। সেই স্বল্পান্ধকারে অশরীরী সীতা, অহল্যা, দ্রৌপদী ও জোয়ান অব আর্ক প্রবেশ করিলেন।

সীতা। আমি আজও পাতালে আছি।

অহল্যা। আমারও পাষাণত্ব ঘোচে নি এখনও। গৌতমের দাসী ইন্দ্রের অনুগৃহীতা পৌরাণিক কল্পনাটাই রামচন্দ্রের পদস্পর্শে সঞ্জীবিত হয়েছিল, আমি নয়।

দ্রৌপদী। কৌরবের রাজসভায় দুঃশাসন আমার কেশাকর্ষণ ক'রে উলঙ্গ করবার চেষ্টা করেছিল, দুর্যোধন উরু দেখিয়েছিল, খলখল ক'রে হেসে উঠেছিল কর্ণ, তবু আমি আত্মরক্ষা করতে পারি নি। আমি যে অপমানিতা, তা প্রমাণ করবার জন্যে ধর্মরাজের সঙ্গে তর্ক করতে হয়েছে। প্রতিশোধকামনায় কাঁদতে হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের কাছে, শরণাপন্ন হতে হয়েছে অর্জুনের, উত্তেজিত করতে হয়েছে ভীমকে। কুরুক্ষেত্রের সমরানলে যা প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল, তা পৌরুষের অহঙ্কৃত বহ্নি। তখন বুঝি নি, কিন্তু এখন জেনেছি, আসলে তা নারীর আত্মসম্মানের

চিতা। দুঃশাসনের তপ্ত-শোণিতে বেণী বন্ধন করেছিলাম, কিন্তু দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করেছিলেন ভীম, আমি নয়। আমার অন্তরের জ্বালা প্রদীপ্ত করেছে পুরুষকে, আমি শুধু হাহাকার করেছি।

জোয়ান অব আর্ক। তা ছাড়া আমরা আর কিছু পারি না বোধ হয়। আমি যুদ্ধে নেবেছিলাম, কিন্তু ওরা আমায় পুড়িয়ে মেরে ফেললে। এখন মনে হয়, ওদেরই আগুন আছে, আমাদের আছে বোধ হয় শুধু দেহটা। পুরুষ সৈনিকদের মনে আমার জীবন্ত যৌবনের স্পর্শ যে আগুন জ্বালিয়েছিল, তা আমার আগুন নয়, আমার প্রভাব। আমার শীতল প্রস্তরমূর্তিটা আজও সে প্রভাব বিকীর্ণ করছে ক্ষীণভাবে। আমরা কেউ নই। আমরা পুরুষদের মনে যে ভাব জাগাই, তাই আমাদের পরিচয়।

পথ হাতড়াইতে হাতড়াইতে স্খলিত-চরণা গান্ধারী প্রবেশ করিলেন।

গান্ধারী। অন্ধকার, চতুর্দিক অন্ধকার···চোখের কাপড়টা সরাতে পারছি না···মনের সামনেও অন্ধকার যবনিকা তুলছে···

যতীন। কিন্তু আপনারা যে স্বাতন্ত্র্য কামনা করছেন, তা পেলেই কি সুখী হতেন? বলুন না, কি চান আপনারা?

কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে সকলে চলিয়া গেলেন। এতক্ষণ যে পাখির করুণ কণ্ঠস্বর অস্পষ্টভাবে উক্ত দৃশ্যের পটভূমিকা রচনা করিতেছিল, তাহা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। ফটিক জল—ফটিক জল—ফটিক জল। মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহা বাতায়ন-পথে প্রবেশ করিল

যতীন। ফটিক জল কি জিনিস বল তো? দেখেছ কখনও?

পাখির সুর। চোখে দেখি নি, স্বপ্নে দেখেছি।

যতীন। কি রকম শুনি?

পাখির সুর। স্বচ্ছ কঠিন পাথরের বুকের ভিতর টলমল করছে তরল জ্যোতির বিন্দু।

যতীন। তাই চাও তুমি?

পাখির সুর। অন্য কিছুতে তৃপ্তি নেই।

টিকটিকি। ওসব কবিত্ব অনেক শুনেছি দাদা। আমি নিজে তোমায় পুকুরের জল খেতে দেখেছি। সত্যি কথা হচ্ছে, পিপাসার সময় যে কোনও জলই ফটিক জল, ক্ষুধার সময় যে কোনও খাদ্যই সুখাদ্য।

পাখির সুর। সুখাদ্য নয়, খাদ্য। ওই সুই তো স্বপ্ন সৃজন করে। তাই তো মাটি ছেড়ে ডানা মেলে আকাশে উড়েছি।

টিকটিকি। [সশ্লেষে] ঠিক ঠিক।

প্রস্তর-তরুণীর দীর্ঘনিশ্বাস আবার শোনা গেল। যতীন তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল এবং নির্নিমেষ হইয়া রহিল। তাহার মনে হইল, প্রস্তর ভেদ করিয়া অশরীরী নীলা বাহির হইয়া আসিতেছে। যতীন সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। পাখির সুর ধীরে ধীরে বাতায়ন-পথে বাহির হইয়া গেল।

নীলা। যতীনদা, আমি এসেছি।

যতীন। নীলা!

নীলা চুপ করিয়া রহিল। তাহার চোখের দৃষ্টিটা শুধু বাঙ্ময় হইয়া উঠিল। তাহা যেন নীরবে বলিল, হ্যাঁ, ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, আমি নীলাই।

যতীন। তোমার আজ বিয়ে না?

নীলা। হ্যাঁ।

যতীন। তবে এলে যে এখন ?

নীলা। ক্ষমা চাইতে এসেছি।

যতীন। [সবিস্ময়ে] কিসের ক্ষমা !

নীলা। এতদিন তোমাকে প্রলুব্ধ করেছি ব'লে।

যতীন অধীর হইয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু নীলা তাহাকে থামাইয়া দিল।

নীলা। প্রতিবাদ ক'রো না, তোমার চেয়ে আমি ভাল জানি, আমাকে বলতে দাও। হ্যাঁ, প্রলুব্ধই করেছি,— ইচ্ছে ক'রে নানা ছলে তোমাকে আমি প্রলুব্ধ করেছি এতদিন। কিন্তু এইবার সব শেষ। হাসি কথা রূপ যৌবনের মায়ালোক সৃষ্টি ক'রে তোমাকে আকুল ক'রে তুলেছিল যে নীলা, তার মরণ ঘনিয়ে এসেছে এবার। মৃত্যুর নিবিড় অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে যাবার আগে তাই সে ক্ষমা চাইতে এসেছে। তোমাকে ঠকিয়েছিলাম। তোমার মুগ্ধ কল্পনায় যে লোলুপ আশা মূর্ত ক'রে তুলেছিলাম, তা পূর্ণ করবার সামর্থ্য আমার নেই। কোনদিনই ছিল না। রাঙতা-মোড়া যে জিনিসটা দেখে তুমি প্রলুব্ধ হয়েছিলে, তা মাটির ঢেলা, সন্দেশ নয়। আমি আলো নয়, আলেয়া। [হাসিয়া] অদ্ভুত মনে হচ্ছে, না ? মরীচিকা ক্ষমা চাইছে পথ-ভ্রান্ত পথিকের কাছে ! কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি মরীচিকাই— এই আমার স্বরূপ—আমি অন্যরকম হতে পারতাম না। ক্ষমা চাইবার অধিকার আমার আছে, কারণ আমি নিজেকে জেনেছি এবং অকপটে স্বীকার করেছি সব। আমি যা করেছি, তা অনিবার্য ছিল আমার পক্ষে। আমায় ক্ষমা কর তুমি।

যতীন। ক্ষমা করবার কোনও প্রশ্ন তো ওঠে না নীলা। আমিও তো তোমাকে ভোলাতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, দুজনে মিলে এক অপূর্ব স্বর্গলোক সৃষ্টি করব এই মাটির পৃথিবীতে। কল্পনা

করেছিলাম, আমাদের নন্দন-কাননে যে পারিজাত ফুটবে তার পাপড়িতে থাকবে তোমার রূপ, পরাগে থাকবে আমার সৌরভ— যে সঙ্গীত মূর্ত হয়ে উঠবে আমি হব তার কথা, তুমি হবে তার সুর। তুমি যদি আসতে, এ স্বর্গ সম্ভব ক'রে তুলতে পারতাম। তুমিই তো এলে না। তুমি যদি আসতে, সকলের অমতেও আমি বিয়ে করতাম তোমায়।

নীলা। আসি নি তার কারণ নিজেকে আমি চিনি। আমাকে বিয়ে করলে তোমার বাবা তোমায় ত্যাজ্যপুত্র করতেন! আমি জানি, আমাকে নিয়ে দারিদ্র্য বরণ করতেও আপত্তি ছিল না তোমার, কিন্তু নিজের নিঃস্বতায় ভয় পেয়ে গেলাম। আমার কি আছে যে তোমাকে দেব, তোমার স্বর্গসৃষ্টির কণামাত্র উপকরণও যে আমার মধ্যে নেই। যৌবনের জোয়ার যখন নেবে যাবে তখন শিথিল-পেশী এই দেহপিণ্ডটার মধ্যে কাদা আর আবর্জনা ছাড়া যে আর কিছুই থাকবে না। দারিদ্র্যের মধ্যে সেই ক্লিন্ন গ্লানি নিয়ে তুমি যে স্বর্গসৃষ্টি করতে পারবে না তা আমি জানতাম, তাই আসি নি।

যতীন। কিন্তু প্রবালের কাছে তো গেছ, সেও তো দরিদ্র?

নীলা। প্রবাল স্বর্গসৃষ্টি করতে চায় না, আমাকে চায়—মানে, আমার এই দেহটার বেশি আর কিছু কাম্য নেই তার। আমিও আমার দেহটার বেশি আর কিছু নই। সে যা চেয়েছে তাই পাবে, ঠকবে না।

যতীন। কিন্তু নীলা সত্যিই কি তুমি দেহটা ছাড়া আর কিছু নও? তুমি যা এতক্ষণ বললে, তা কি একটা মাংসপিণ্ডের উক্তি?

নীলার ঠোঁট দুইটা সহসা কাঁপিয়া উঠিল। যতীনের ভয় হইল, চোখের কোণে এইবার জল দেখা দিবে বুঝি। কিন্তু জলের বদলে আগুন দেখা দিল।

নীলা। মাংসপিণ্ডের একটা বক্তব্য থাকতে পারে বইকি। তোমার মুখেই একদিন শুনেছিলাম যে, জড়ের মধ্যেও বিদ্যুৎ আছে,

তারও প্রতি পরমাণুতে সৌরজগতের বহু্যুৎসব বর্তমান। মাংসপিণ্ডও বিদ্যুৎ-পিণ্ড, তার বক্তব্যও চমকপ্রদ হওয়া অসম্ভব নয়। আমি কিন্তু চমকপ্রদ কিছু করতে আসি নি, ক্ষমা চাইতে এসেছি। তুমি ক্ষমা করেছ, এইটুকু জানতে পারলেই চ'লে যাব।

যতীন। ক্ষমা করার প্রশ্ন উঠছে কি ক'রে, তাই আমি বুঝতে পারছি না। তোমাকে আমি চেয়েছিলাম, পাই নি। তুমি যাকে বেছে নিয়েছ, সে যে কিসে তোমার যোগ্য, তাও আমার বুদ্ধির অগম্য। আমি একটা প্রহেলিকার মধ্যে দিশাহারা হয়ে আছি, ক্ষমা করার কোনও সঙ্গতি তো আবিষ্কার করতে পারছি না। তুমি সহজ ভাষায় আমাকে বল, কেন তুমি আমাকে চাও নি, কেন তুমি সকলের দ্বারে দ্বারে রূপ-যৌবনের পণ্যপসরা নিয়ে ঘুরে বেড়ালে, কেনই বা অবশেষে আত্মসমর্পণ করলে প্রবালের কাছে?

টিকটিকি। [জনান্তিকে, ফিসফিস করিয়া] এস এস, এইবার এস। ভেঙে দাও হাঁড়িটা হাটের মাঝখানে।

বিরাট একটা মুণ্ড বাতায়ন-পথে প্রবেশ করিল। আকর্ণবিস্তৃত মুখ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তীক্ষ্ণ দাঁত, লালায়িত রসনা, দুই কশ বাহিয়া লালা ঝরিতেছে, চক্ষুর দৃষ্টি লোলুপ। নীলা তাহাকে দেখিয়া ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল।

যতীন। [চমকাইয়া] কে তুমি?

আগন্তুক মুণ্ড। আমি লোভ, [নীলাকে দেখাইয়া] ওর লোভ। আমিই ওকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছি। হি-হি-হি-হি···শাড়ি গাড়ি গয়না···হি-হি-হি···বড় চাকরি, ব্যাঙ্কে মোটা টাকা···রুই কাতলা গাঁথবার চেষ্টায় ছিল···হি-হি···পারলে না, টোপ গিললে না কেউ··· তুমি গিয়েছিলে, কিন্তু তোমার বাবা ত্যাজ্যপুত্র করবেন বলাতে ভেস্তে গেল সব··· বঁড়শি খুলে নিয়ে অন্য ঘাটে ছিপ ফেলতে হ'ল আবার··· হি-হি-হি···

যতীন। প্রবাল তো রুইও নয়, কাতলাও নয়!

লোভ। মাছই নয়—কাদা। সেখানে গিয়েছিলেন নাচতে—হি-হি···পিছলে গেলেন, এঁটেল মাটির চটচটে কাদা মাখামাখি হয়ে গেল সর্বাঙ্গে, লুকোবার আর উপায় রইল না, ধরা প'ড়ে গেল। আহা! বড় সাধ ছিল—শাড়ি গাড়ি গয়না—তিন সেট গয়না—ব্যাঙ্কে মোটা টাকা—প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি—গেটে দারোয়ান থাকবে··· হি-হি—

লালায়িত রসনা বাহির করিয়া উপরের ও নীচের ঠোঁট বীভৎসভাবে চাটিতে লাগিল। মুখে অদ্ভুত হাসি। যতীন নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। লোভ ধীরে ধীরে বাতায়ন-পথে বাহির হইয়া গেল। যতীন নীলার দিকে ফিরিয়া দেখিল, তাহার চোখে মুখে আগুন জ্বলিতেছে।

নীলা। শুনলে তো, তোমার উপর আস্থা স্থাপন করতে পারি নি ব'লে তোমাকে ত্যাগ করেছিলাম।

যতীন। বুঝতে পারলাম না।

নীলা। জীবনে আমার যা কাম্য, তা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা ছিল তোমার বাবার টাকায়। পিতৃধনবঞ্চিত তোমার উপর আমার কোন ভরসা ছিল না।

যতীন। কেন, তুমি কি মনে কর, আমি কিছু রোজগার করতে পারব না?

নীলা। পারতে, যদি ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মাতে। তখন তোমার এম. এ. ডিগ্রীর বাজার-দর ছিল, এখন কিছুই নেই। ক্ষুদিরাম যেদিন মজঃফরপুরে বোমা ফেললে, সেইদিন থেকেই শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর কপালে ফাটল ধরল—এ কথা তো তোমার মুখেই শুনেছি। সুতরাং তোমার উপর নির্ভর করব কোন্ আশায়?

যতীন। চাকরি পাব না তা ঠিক, করবারও ইচ্ছে নেই, কিন্তু

এমন অনেক স্বাধীন ব্যবসা আছে, যা ঠিকমত করতে পারলে অনেক উপার্জন করা যায়।

নীলা। সেটা অনিশ্চিত। অত সবুর আমার সইত না।

যতীন। শাড়ি-গয়নাটাই তোমার কাছে বড় হ'ল নীলা? ভালবাসাটা তোমার কাছে কিছু নয়?

নীলা। [সবিস্ময়ে] কে বললে, আমি তোমায় ভালবেসেছিলাম? আমি তো তোমায় ভালবাসি নি, আমি তোমায় ভুলিয়েছিলাম।

যতীন। কিন্তু বেশ মনে পড়ছে, তুমি নিজের মুখে একদিন বলেছিলে যে, আমায় ভালবাস।

নীলা। তখনই তোমার সন্দেহ করা উচিত ছিল। ভালবাসার কথা মুখ ফুটে বলে না কেউ কখনও।

যতীন। কিন্তু আমি যে তোমায় ভালবেসেছিলাম, সেটা তো তোমার অজ্ঞাত ছিল না, তার কি কোনও মূল্য নেই?

নীলা। মূল্য আছে, কিন্তু নিছক ভালবাসাকে মূল্য দিতে হ'লে অন্তত ডজন খানেক ভালবাসাকে মূল্য দিতে হয়। ঘেয়ো কুকুরের পিছু পিছু একপাল মাছি যেমন ভনভন ক'রে ওড়ে, রূপসী যুবতীর পিছু পিছু উড়ে বেড়ায় তেমনই একপাল ভালবাসা। তার মধ্যে কোন্‌টা স্বর্গীয় কোন্‌টা পার্থিব তা বিচার করবার প্রবৃত্তিও থাকে না, সামর্থ্যও থাকে না। আর্থিক মাপকাঠি দিয়েই মাপতে হয় তাদের।

টিকটিকি। ঠিক ঠিক। ঘেয়ো কুকুরের উপমাটা কিন্তু ঠিক হ'ল না। বলা উচিত ছিল, কার্তিক মাসে কুক্কুরী যেমন বলিষ্ঠতম প্রণয়ীর কাছেই আত্মসমর্পণ করে, আমিও তেমনই মালা দিতে চেয়েছিলাম শ্রেষ্ঠ ধনীর গলায়, কারণ বর্তমান যুগে অর্থই শক্তি। ভাল ক'রে গুছিয়ে বল।

যতীন। [নীলাকে] ছি ছি, তোমারও ওই মত নাকি?

নীলা। [নির্বিকারভাবে] সন্দেহ করছ কেন?

যতীন। ভালবাসার কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু ঐশ্বর্যই

একমাত্র কাম্য তোমার জীবনে? উচ্চতর আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই?

নীলা। আছে কি না জানি না। ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, মনের ভিতর কোন উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা আছে কি না তা অনুসন্ধান করবার অবসর পাই নি এখনও।

যতীন। কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটাবার জন্মে ঐশ্বর্যই চাই? সাধারণ খাদ্য-পানীয়ে তা মিটবে না?

নীলা। না। আমি যে অসাধারণ। তুমিই তো একদিন বলেছিলে, আমি কোহিনুর। যেখানে সেখানে কি কোহিনুর মানায়? তার স্থান স্বর্ণমুকুটের মাঝখানে, পচা আঁস্তাকুড়ে নয়।

যতীন। আঁস্তাকুড়ের কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করতে এসেছ কেন তবে?

নীলা। আমরা যে মায়ের জাত, আঘাত পেয়ে কেউ যখন 'উহুহু' ক'রে ওঠে, তখন আমরা থাকতে পারি না, ছুটে যাই। এ ক্ষেত্রে আরও বিশেষ ক'রে এসেছি, কারণ আঘাতের হেতু আমিই। তাই ক্ষমা চাইছি। তোমার গলায় মালা দিতে পারি নি ব'লে তোমার ব্যথাতেও হাত বুলিয়ে দিতে পারব না? সে অধিকার যে সব মেয়েরই জন্মগত অধিকার।

যতীন। [হাসিয়া] আঁস্তাকুড়ে এসে কেন অপবিত্র করছ নিজেকে। আমার কোনও আঘাত লাগে নি, যাও তুমি।

নীলা। সত্যি লাগে নি? [হাসিয়া] তোমাদের শিশুত্ব কোনকালে ঘোচে না, আশ্চর্য! একটা অদ্ভুতরকম অবাস্তব লোকে বাস কর তোমরা। কাব্যের ক্লিওপেট্রাকে নিয়ে তোমরা উন্মত্ত, কিন্তু বাস্তবজীবনে তার সামান্য ছোঁয়াচটুকু পর্যন্ত সইতে পার না।

যতীন। পারি' কি না, তা জানবার সুযোগ তো তোমার হ'ল না। সাহস ক'রে যদি আসতে, আসল পরিচয় পেতে পারতে হয়তো।

নীলা। বরাবর অমনই ভদ্র পোশাকী ভাষায় আহ্বান করেছ ব'লেই আরও যেতে পারি নি। ভয় হয়েছে, বাইরের ওই রঙিন লেফাফাটার ভিতরে হয়তো শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই।

সহসা সমস্ত অবলুপ্ত হইয়া গেল। অপূর্ব দিব্য আলোকে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বাতায়ন-পথে যতীন দেখিতে পাইল, অদূরে মহাগিরি রৈবতক। দেবার্চনা সমাপন করিয়া বসুদেব-দুহিতা সুভদ্রা গিরি প্রদক্ষিণ করিতেছেন। অকস্মাৎ তিনি সচকিত হইয়া, ঘাড় ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন…দূরাগত অশ্বক্ষুরধ্বনি পার্বত্য শান্তি বিঘ্নিত করিতেছে…এক অশ্ববাহিত রথ প্রচণ্ড বেগে রৈবতক অভিমুখে আসিতেছে…দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল…সুবর্ণ-কিঙ্কিণী-জালালঙ্কৃত প্রজ্বলিত হুতাশনকল্প দিব্যরথ…রথে বসিয়া আছেন মহাবীর অর্জুন…ক্ষাত্রবীর্যের মূর্ত প্রতীক…চোখের দৃষ্টি নির্ভয় একাগ্র… পরিধানে কবচ, বর্ম, অঙ্গুলিত্রাণ। আশায় আশঙ্কায় আনন্দে উত্তেজনায় সুভদ্রা শিহরিয়া উঠিলেন; কিন্তু চীৎকার করিলেন না, পলায়নও করিলেন না…মুহূর্তমধ্যে রথ নিকটবর্তী হইল…অর্জুন রথ হইতে নামিয়া সুভদ্রাকে রথে তুলিয়া বায়ুবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলেন…অশ্ব-ক্ষুরোত্থিত ধূলিজালের দিকে যতীন সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল… তাহার পর একটা কোলাহল শোনা গেল…ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ আস্ফালন করিতেছেন… তাহাও ক্রমশ থামিয়া গেল…দিব্য আলোক অন্তর্হিত হইল…। যতীন দেখিল, নীলা তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

নীলা। [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া] যদি আমাকে সবলে অধিকার ক'রে অভিমন্যুজননীর মর্যাদা দিতে পারতে, তা হ'লে এ দুর্দশা হ'ত না আমার। বীরভোগ্যা আমরা, তোমাদের অক্ষমতায় আজ বর্বরভোগ্যা হয়েছি। আমার উপর রাগ ক'রো না যতীনদা, আমার ব্যথাটা বোঝবার চেষ্টা কর। চললাম।…

অশরীরী নীলা অন্তর্হিত হইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে ব্যক্তিটি প্রবেশ করিলেন, তাঁহার মূর্তি ভয়ঙ্কর। আকৃতি দীর্ঘ, বর্ণ কৃষ্ণ, সমস্ত মুখমণ্ডল কৃষ্ণ কুঞ্চিত রোমে সমাচ্ছন্ন। চক্ষু দুইটি অতিশয় প্রদীপ্ত। মনে হইতেছে, দুইটি হীরকখণ্ড যেন কালো মখমলের আবেষ্টনীতে জ্বলিতেছে। আগন্তুকই প্রথমে কথা কহিলেন।

আগন্তুক। আমি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। পাছে ভুল বোঝ, তাই আমাকে আসতে হ'ল। অর্জুন যা করেছিল, তা সেকালে নিন্দনীয় ছিল না। শোলার টোপর প'রে বিয়ে করা এখন যেমন তোমাদের বর-ধর্ম, নারী হরণ ক'রে বিয়ে করাটা তেমনই সেকালের বীর-ধর্ম ছিল। সুভদ্রা-হরণে প্রলুব্ধ হবার আগে অর্জুন হতে হবে, এই কথাটা মনে করিয়ে দিতেই আমি এসেছিলাম।

অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

টিকটিকি। [হাসিয়া] লোকটা ভারি বেরসিক তো, সব ভেস্তে দিয়ে গেল!

যতীন। তুমি কি ভেবেছিলে, আমি নারীহরণ করতে চাই!

টিকটিকি। লুণ্ঠনের সপক্ষে একটা যুক্তি পেয়ে মনে মনে একটু খুশি হয়ে উঠেছিলে বইকি। তোমাদের ওই যে এক মহদ্দোষ, পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ।

যতীন। ওটা দোষ নয়, গুণ। মনুষ্যত্বের লক্ষণ। নিছক পশুর মৌখিক লজ্জা থাকে না।

টিকটিকি। থাকবার দরকার কি, তাও তো বুঝি না।

অশরীরী ডারবিন আবির্ভূত হইলেন।

ডারবিন। মনুষ্যনামধেয় পশুর জীবনযুদ্ধে ওইগুলোই দামী উপকরণ। লজ্জা, ক্ষমা, অহিংসা অর্থহীন মানস-বিলাস নয়, নিপুণ যোদ্ধার উৎকৃষ্ট অস্ত্র ওগুলো। নখদন্তেরই বিবর্তিত রূপ।

এ বিষয়ে যতীনের মন বহু দিন হইতেই প্রশ্নাকুল ছিল। সে আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিল না।

যতীন। আমার একটা কথার জবাব দেবেন?

ডারবিন। কি বল?

টিকটিক। [অর্ধস্বগত] ক্রমাগত দেড়ে লোকের আমদানি হতে লাগল। স’রে পড়া যাক।

টিকটিকি ধীরে ধীরে ব্র্যাকেটের অন্তরালে আত্মগোপন করিল।

যতীন। লজ্জা, ক্ষমা, অহিংসা এই সব বিবর্তিত অস্ত্র নিয়ে কি মানুষ শেষ পর্যন্ত জীবন-যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে?

ডারবিন। [হাসিয়া] তা ঠিক জানি না। মানে, জীবনটা যে কতদূর বিস্তৃত, দেহের সীমা ছাড়িয়েও তার অস্তিত্ব আছে কি না, থাকলেও কতদূর আছে, তা এখনও ঠিক করতে পারি নি আমি। তবে এইটুকু শুধু বলতে পারি, সব মানুষ একজাতের নয়, সব অস্ত্রও সকলের জন্য নয়। মনুষ্যত্বেরও নানা স্তর আছে, প্রত্যেক স্তরের আকাঙ্ক্ষা-আদর্শও ভিন্ন, অস্ত্র-শস্ত্রও ভিন্ন হতে বাধ্য। তা ছাড়া অস্ত্র পেলেই তো ব্যবহার করা যায় না। তার জন্যে শিক্ষা চাই, সাধনা চাই, স্বাভাবিক প্রবণতাও চাই। বোলতা তার হুলকে কাজে লাগায়, তুমি সে হুল হাতে পেলেও তেমন ভাবে ব্যবহার করতে পার না, তোমার বন্দুকও বোলতার কাছে অর্থহীন। মানুষদের মধ্যেও ঠিক তেমনই। অহিংসা একজনের কাছে শক্তি, আর একজনের কাছে অক্ষমতা।

বাতায়ন-পথে একটা দমকা হাওয়া ঢুকিল। ডারবিন চলিয়া গেলেন। খবরের কাগজটা টেবিল হইতে উড়িয়া গেল। ফুলের গন্ধে সমস্ত ঘর ভরিয়া উঠিল। যতীন খবরের কাগজটা তুলিয়া দেখিল, বলিষ্ঠ ঝাঁকড়া-চুল-ওয়ালা একটি দৈত্য ফুটফুটে সুন্দরী একটি মেয়েকে কাঁধে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েটিকে কাঁধ হইতে নামাইয়া দৈত্যটা মাথা নাড়িয়া এক ঝটকায় ঝাঁকড়া চুলগুলো চোখমুখ হইতে সরাইয়া ফেলিল। তাহার চক্ষু দুইটি হাস্যদীপ্ত, তাহা হইতে শিশুসুলভ সরলতা যেন উপচাইয়া পড়িতেছে। আকৃতিতে দৈত্য হইলেও, প্রকৃতিতে সে যেন ওই ছোট মেয়েটিরই সঙ্গী।

দৈত্য। যাঃ চ'লে—এ কোথায় এসে পড়লে? বললাম, চল্ মাঠের মাঝখান দিয়ে হু-হু ক'রে ছুটে গঙ্গার চর পেরিয়ে, ধানের ক্ষেতে ঢেউ তুলে, পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওধারে গিয়ে খবর নিয়ে আসি। ঘরের কোণে ঢুকলি কেন?

মেয়েটি। দাঁড়াও না, খুঁজে নিই এখানটা। শুনলে তো, এই ঘরেই ঢুকেছিল।

দৈত্য। নে তা হ'লে চটপট। উফ্—দমবন্ধ হয়ে আসছে এখানে।

হাত দিয়া নিজেকে বাতাস করিতে লাগিল।

মেয়েটি। [যতীনকে] ভোমরা এসেছিল এখানে?

যতীন। এসেছিল একটু আগে। এখন তো নেই।

মেয়েটি। কোথা গেল বলতে পার?

যতীন। ওই জানলা দিয়ে তো বেরিয়ে গেল। ভোমরাকে খুঁজছ কেন?

মেয়েটি। ফুল ডেকেছে তাকে। অনেকক্ষণ থেকে খুঁজছি। জামগাছের কোটরে তার বাসা, সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখি, বেরিয়ে

গেছে। মাঠের মাঝে বাবলা-বুড়ী দাঁড়িয়ে ছিল, সে বললে, এই দিকে উড়ে এসেছে। তারপর দেখা হ'ল গঙ্গাফড়িঙের সঙ্গে, তোমার বাগানে রঙ্গনগাছের উপর ব'সে আছে, সে বললে, ঢুকেছে তোমার ঘরে। তুমি বলছ, জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। [সন্দিগ্ধভাবে] কোথাও লুকিয়ে রাখ নি তো ?

যতীন। না।

মেয়েটি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে যতীনের দিকে চাহিয়া রহিল। মেয়েটির দিকে চকিতে একবার চাহিয়া দৈত্যটাও ঘাড় ফিরাইয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে যতীনের দিকে চাহিল।

দৈত্য। [মেয়েটিকে] চেয়ার টেবিল খাট বিছানা উলটে দিই ? দেখবি খুঁজে ? জিজ্ঞেস ক'রে সময় নষ্ট করবার দরকার কি ? দেব ?

মেয়েটি। [ধমক দিয়া] না। ভদ্রলোকের বাড়িতে গুণ্ডামি করতে হবে না। তা ছাড়া ওলটপালট ক'রে দিলেই কি খোঁজা হয় ?

দৈত্য সঙ্গে সঙ্গে ভালমানুষের মত মুখ ফিরাইয়া হাত দিয়া নিজেকে আবার বাতাস করিতে লাগিল।

মেয়েটি। [যতীনকে] কিছু মনে ক'রো না তুমি, ওর স্বভাবই ওই রকম দুরন্তপনা করা।

যতীন। ও কে ?

মেয়েটি। ও ? ও আমার বাহন। [হাসিয়া] ওর অনেক নাম।

যতীন সবিস্ময়ে দৈত্যটার দিকে চাহিয়া রহিল। মুখে কিছু বলিতে না পারিলেও তাহার মনের কথা চোখের দৃষ্টিতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দৈত্যও তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। দৈত্যের মনের ভাবও তাহার

চোখের দৃষ্টিতে মূর্তি পরিগ্রহ করিল। টিকটিকি সন্তর্পণে ব্র্যাকেটের তলা হইতে বাহির হইয়া আসিল।

যতীনের মনের ভাব। কি আশ্চর্য, তোমার মত একটা লোক এমন সুন্দরী মেয়ের বাহন!

দৈত্যের মনের ভাব। ওকে বহন করবার একমাত্র অধিকার আমারই আছে।

যতীনের মনের ভাব। কেন?

দৈত্যের মনের ভাব। কারণ আমার শক্তি আছে। শক্তিমানই সৌন্দর্যকে বহন করবার অধিকারী। আমি ওকে বহন করি, রক্ষা করি, প্রচার করি। আমি পবন, ও সুরভি।

টিকটিকি। ঠিক ঠিক ঠিক। পবনদেব, আমার প্রতি একটু দয়া করবে? ক্ষিধেয় ম'রে যাচ্ছি, দাও না কিছু খাবার যোগাড় ক'রে—তুমি ইচ্ছে করলেই পার।

টিকটিকির উক্তিটা ভিখারীর আবেদনের মত শুনাইল। ধনী যেমন দরিদ্রকে পয়সা ছুঁড়িয়া দেয়, পবন ঠিক তেমনই ঔদাসীন্যভরে বাহির হইতে একটা ছোট কীট উড়াইয়া আনিয়া টিকটিকির মুখে ফেলিয়া দিল। টিকটিকি লুব্ধ আগ্রহে সেটা চিবাইয়া খাইতে লাগিল।

সুরভি। এখানে যখন ভোমরা নেই, তখন চল আমরা যাই। খুঁজে বার করতেই হবে তাকে তাড়াতাড়ি। বেলা তো শেষ হয়ে এল, ফুল বেচারী কতক্ষণ আর অপেক্ষা করবে, সন্ধ্যে পর্যন্ত তো তার মেয়াদ।

পবন। চল।

উভয়ে চলিয়া গেল। যতীনের মনও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া গেল অতীতলোকে।... জতুগৃহে আগুন লাগিয়াছে। সুড়ঙ্গপথে জননীসহ

পঞ্চপাণ্ডব চলিয়াছেন। সুড়ঙ্গপথ অন্ধকার উপলাকীর্ণ। ভীম ব্যতীত আর কেহই সে বন্ধুর পথে চলিতে পারিতেছেন না, মুহুর্মুহু আর সকলেরই পদস্খলন হইতেছে। রাত্রি-জাগরণে সকলেই অবসন্ন। কিন্তু দুর্যোধনের চরেরা চতুর্দিকে ঘুরিতেছে, বিলম্বে সর্বনাশ ঘটিবে। মহাবলপরাক্রান্ত ভীম তখন মাতাকে স্কন্ধদেশে এবং নকুল-সহদেবকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, তাহার পর যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের হস্তদ্বয় ধরিয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন।··· যতীন মুগ্ধ-বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ইনিই পবননন্দন ভীম, যে পবন সুরভিকে বহন করিবার অধিকারী···যে সুরভি··· হঠাৎ ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজিয়া উঠিল। যতীনের মন মুহূর্তে বর্তমানের পটভূমিকায় ফিরিয়া আসিল।

অ্যালার্ম। চল চল চল চল চল চল···

যতীন উঠিয়া অ্যালার্মটা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘড়িকে প্রশ্ন করিল।

যতীন। কি বলছ, কোথায় যাব ?

ঘড়ি। কোথা যাবে, তা তুমিই জান। আমাকে মনে করিয়ে দিতে বলেছিলে, মনে করিয়ে দিলাম।

যতীন। আমার তো কোথাও যাওয়ার কথা ছিল না, লিখতে বসার কথা ছিল।

ঘড়ি। কোন কিছু করা মানেই—চলা।

যতীন। তোমার ঐ ভাষা তো শুনি নি কোনদিন এর আগে !

ঘড়ি। নতুন কান পেয়েছ আজ। শুধু কান নয়, চোখও।

ধীরে ধীরে ঘড়িটা একটা মানুষের মুখের মত হইয়া গেল। অদ্ভুত সে মুখ! সীমাবদ্ধ, কিন্তু অসীম সম্ভাবনাপূর্ণ। ললাটে যেন অনন্ত মহাকাশের ইঙ্গিত, দৃষ্টিতে অসংখ্য সূর্যের আভাস, ওষ্ঠাধরে অভাবনীয় ভাবের আকুতি. রসনাতে অগণিত বাণীর আগ্রহ। তাঁহার সুদূরপ্রসারী

দৃষ্টি যতীনের মুখের উপর নিবদ্ধ হইতেই যতীন বুঝিতে পারিল, দেবতার আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

যতীন। [সসম্ভ্রমে] কে আপনি ?

দেবতা। আমি মহাকাল। অভিনব শ্রবণশক্তি পেয়েছ, একটা কথা শোন। আদর্শকে স্বপ্নে নিবদ্ধ না রেখে বাস্তবে মূর্ত কর। যে স্বপ্নলোকে স্বার্থপরের মত তুমি একা বিচরণ করছ, তার দ্বার খুলে দাও। সকলে সেখানে প্রবেশ করুক, তোমার আদর্শ সকলের আদর্শ হোক, চাওয়া-পাওয়ার ব্যবধান ঘুচে যাক। তবেই তোমার বিদ্রোহ সার্থক।

যতীন। আমি কি বিদ্রোহী ? জানতাম না তো।

দেবতা। নিশ্চয়ই, বিদ্রোহী বইকি। বিদ্রোহী নানা জাতের হয়। বস্তুত প্রত্যেক মানুষই বিদ্রোহী, প্রত্যেক মানুষই নিজের পারিপার্শ্বিককে ছাড়িয়ে মাথা তুলতে চেষ্টা করছে। ওই দেখ…

যতীন প্রথমটা কিছুই দেখিতে পাইল না। চোখের সম্মুখে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নাই। সূচীভেদ্য অন্ধকার। একটু পরে মনে হইল, খানিকটা অন্ধকার যেন নড়িতেছে। সবল একটা অন্ধকার-পিণ্ড যেন গুঁড়ি মারিয়া অগ্রসর হইতেছে। সে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। একটু পরে কিন্তু বুঝিতে পারিল এবং বুঝিতে পারিয়া আরও বিস্মিত হইল। যাহাকে ইনি বিদ্রোহী বলিয়া দেখাইয়া দিলেন, সে একটা চোর। অন্ধকারে গুড়ি মারিয়া বসিয়া সিঁধ কাটিতেছে। অন্ধকার একটু স্বচ্ছ হইল। যতীন শিহরিয়া উঠিল… অসংখ্য বিদ্রোহী…কিলবিল করিতেছে…। কেহ কাহারও বুকে ছুরি বসাইয়াছে, কেহ নারী-ধর্ষণ করিতেছে, কেহ লুণ্ঠনরত। একটি মেয়ে হাসিমুখে স্বামীর খাদ্যে বিষ মিশাইতেছে…

যতীন। এরা বিদ্রোহী?

দেবতা। হ্যাঁ, এরা বিদ্রোহী। সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থায় এরা কেউ সুখী নয়, প্রচলিত আইন অমান্য ক'রে তাই এরা প্রত্যেকে সুখের সন্ধান করছে আপন আপন রুচি অনুসারে। আর এরাও—

অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া একটা সন্ধানী আলোর রেখা আকাশ পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল। যতীন দেখিল, সেই আলোকরেখা ধরিয়া বিরাট মিছিল চলিয়াছে। কয়েকজনকে সে চিনিতে পারিল। যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, লেনিন, মহাত্মাজী, সুভাষ বসু, অ্যাব্রাহাম লিংকন···আরও অনেকে···

দেবতা। সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থায় এঁরাও কেউ সন্তুষ্ট নন। এঁরাও সব উলটে দিতে চান, উলটে দিয়ে আনন্দ পেতে চান। কিন্তু একা একা আনন্দ ভোগ ক'রে তৃপ্তি হয় না এঁদের। এঁরা প্রত্যেকেই নিজের আদর্শ অনুযায়ী সমগ্র সমাজটাকে ভেঙে গড়তে চান, সকলেই যাতে সুখী হয়। তাই করবার জন্যে সারাজীবন কৃচ্ছ্র সাধন ক'রে চলেছেন। এই দেখ, আর এক জাতের বিদ্রোহী···

সন্ধানী আলোর রেখা মিলাইয়া গেল। যতীন দেখিল, দিব্য আলোকে এক অপূর্ব দৃশ্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। নির্মল আকাশে যেন নীলকান্ত মণির দ্যুতি··· দিগন্তপ্রসারী প্রান্তর যেন সবুজের স্বপ্ন দেখিতেছে··· দূরে পাহাড়ের শ্রেণী অদ্ভুত রহস্যময়···আঁকিয়া বাঁকিয়া একটা নদী বহিয়া চলিয়াছে কোন্ সাগরের উদ্দেশ্যে কে জানে···নদীর তীরে ছোট ছোট পল্লী, শান্তির ছোট ছোট নীড় যেন···পাখি ডাকিতেছে—পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা···ফটিক জল—ফটিক জল···বহু কবি বৈজ্ঞানিক ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন···যতীন কয়েকজনকে চিনিল···প্লেটো, টল্‌স্টয়, রুসো, ভল্‌টেয়ার, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ড্যাল্‌টন,··· ফ্যারাডে···হান্‌স্···

দেবতা। এঁরাও প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থায় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব না করতে পেরে নির্জন মানসলোকে সংহরণ করেছেন নিজেদের। কিন্তু এঁরা পলাতক নন। এঁরা তপস্বী। এঁরাই যুগান্তরকারী অবতার। তপস্যাবলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন যুগান্তরকারী যন্ত্র, কবি আবিষ্কার করেন যুগান্তরকারী মন্ত্র।

যতীন চুপ করিয়া রহিল। দৃশ্যপট ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

দেবতা। সব তো দেখলে, এইবার মিলিয়ে দেখ নিজের সঙ্গে। ঝ'ড়ো হাওয়া, অনুর্বর জমি, আলোর অভাব সত্ত্বেও যে স্বপ্নের কুঁড়িটি ধরেছে তোমার মনে, তাকে বাঁচিয়ে রাখ। বাস্তবের পুষ্পে তা মূর্ত হোক—রূপ নিক।

অদৃশ্য হইয়া গেলেন। টাইম্‌পিসের পুরাতন ডায়ালটা আবার স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার টিকটিক শব্দে যতীন শুনিতে লাগিল—রূপ নিক, রূপ নিক। দ্রুতপদে সশরীরে রুমি আসিয়া প্রবেশ করিল। বাইশ বছরের তরুণী। রূপসী। শুধু দেহের রূপ নয়, মনের রূপও তাহার চোখে মুখে ঝলমল করিতেছে।

রুমি। আমি বিদেয় ক'রে দিয়ে এলাম লোকটাকে ছোটদা। তুমি কি করছ একা একা এই তেতলার ঘরে ব'সে?

যতীন। কোন্ লোকটাকে?

রুমি। যিনি আমাকে দেখতে এসেছিলেন। [হাসিয়া] কোন অভদ্রতা করি নি; কেবল বল্‌লাম, যতদূর মনে হচ্ছে, আপনি রাঁধুনী কিংবা চাকরাণী খুঁজতে বেরিয়েছেন। আমাদের বাড়িতে সে রকম তো কেউ নেই আপাতত।

যতীন। [সবিস্ময়ে] এই কথা বললি তুই! কি বললে তারা?

রুমি। কি আবার বলবে, মুখ কালো ক'রে ব'সে সন্দেশ গিলতে লাগল, আমি উঠে চ'লে এলাম।

যতীন। সেজদা ছিল না?

রুমি। হ্যাঁ, বড়দা, মেজদা, সেজদা সবাই ছিল।

যতীন। সেজদা কিছু বলে নি?

রুমি। বড়দা আর মেজদার ভয়ে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে নি, কিন্তু চোখের দৃষ্টি থেকে যা ফুটে বেরুচ্ছিল, তা মনুর পঞ্চম অধ্যায়। মেজদা কিন্তু বেশ মজার কথা বলেছে একটি, যদিও বড়দার কাছ থেকে ধমক খেলে বেচারী সে জন্যে।

যতীন। কি কথা?

রুমি। মেজদা প্রথমে একটি কথা বলেন নি, কিন্তু আমি ওই কথা ব'লে উঠে আসবার পরই একজন বললেন, আমাদের বাড়িতে গিয়ে আপনাদের মেয়েকে অবশ্য রাঁধতে হবে না, বাসনও মাজতে হবে না। কিন্তু মানুষের অবস্থা বলা তো যায় না, কার কখন কি হবে কে বলতে পারে? আপনাদের মেয়ে ইতিহাসে এম. এ. পাস, সে কথা তো জানিই আমরা, কিন্তু ভগবান না করুন, যদি দুঃখের দিন আসে, তখন হাতা বেড়ি ধরতে পারবে কি না, তা জানতে চাওয়াটা কি অন্যায়? মেজদা তখন বললেন, না, কিছুমাত্র অন্যায় নয়। আপনারাও আপনাদের ছেলেকে আশা করি মসলা-পেশা কাঠ-চ্যালানো কুয়ো থেকে জল তোলা প্রভৃতিতে দক্ষ করেছেন। সত্যিই তো, কখন কি হয় কে বলতে পারে? মেজদার চোখ দুটো বাঘের মত জ্বলছিল। আমি পাশের ঘরে জানলা দিয়ে দেখছিলাম তো সব।

যতীন। বড়দা কি বললেন?

রুমি। বড়দা মেজদার দিকে ফিরে বললেন, ও-রকম কথা বলছ কেন তুমি? তোমাদের অভদ্র ব্যবহারে মাথা হেঁট হয়ে গেল আমার। তারপর ওঁদের দিকে ফিরে বললেন, খুবই লজ্জিত আমি, আমাদের ক্ষমা করুন। আচ্ছা, নমস্কার। ওঁদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন গিয়ে।

বাড়িতে এসে সেজদার সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, তোমার পছন্দর প্রশংসা করতে পারলাম না। রুমির বিয়ের জন্যে ভাবতে হবে না তোমাকে। তুমি তোমার ঠাকুরঘর নিয়েই থাক।

যতীন। [হাসিয়া] যাক, এ যাত্রা নিস্তার পেয়ে গেলি।

টিকটিকির কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছিল। সে আগাইয়া আসিল এবং রুমিকে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

রুমি। [আবদার করিয়া] আমার একটা উপকার করবে ছোটদা?

যতীন। কি?

রুমি। বেশ ভাল ক'রে একটা অ্যাপীল লিখে দেবে? অ্যাপীলের বাংলা কি—আবেদন? লিখে দাও না, তুমি তো বেশ লিখতে পার।

যতীন। কিসের আবেদন?

রুমি। বাংলা দেশের সমস্ত কুমারী মেয়েদের একটা সমিতি গঠন করতে চাই আমি—অনেকটা ট্রেড ইউনিয়ন গোছের। তার উদ্দেশ্য হবে—কুমারী মেয়েদের সম্মান রক্ষা করা। বাংলা দেশের পুরুষদেরই তা করা উচিত ছিল, কিন্তু তা যখন তাঁরা করেন নি, করবার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না, তখন আমাদের নিজেদেরই তা করতে হবে। বাংলা দেশের সমস্ত কুমারী মেয়ে যদি সত্যিই আমার দলে যোগ দেয়, তা হ'লে বাংলা দেশের পুরুষদের শিক্ষা দিয়ে দিতে পারি। কোনও মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কোনও রকম অসম্মানজনক প্রস্তাব করে যদি কেউ, তাকে বয়কট করব আমরা। বাংলা দেশের কোনও মেয়ে তাকে বিয়ে করবে না। আমরা নিজেদের অত্যন্ত সস্তা ক'রে ফেলেছি ব'লেই ওরা ভুলে গেছে যে, বিয়ে করাটা শুধু আমাদেরই প্রয়োজন নয়, ওদেরও প্রয়োজন। এ দেশের মেথর, মুচি, ধোবা, নাপিত, কুলি, কেরানী, সবাই নিজেদের দর বাড়িয়ে নিয়েছে ধর্মঘট ক'রে, কেবল আমরাই প'ড়ে আছি মূল্যহীন অবহেলিত, অপমানিত। অথচ আমরাই গার্হস্থ্যের

ভিত্তি, ভবিষ্যৎ সমাজের জননী, আমাদেরই অসম্মানের পঙ্ককুণ্ডে ডুবিয়ে রেখেছ তোমরা, আর ভণ্ডামির মুখোশ প'রে সতীলক্ষ্মী-মহিমার বাঁধা বুলি আউড়ে চলেছ শতাব্দীর পর শতাব্দী। এ আর সহ্য করব না আমরা, সহ্য করা উচিত নয়। এই কাজেই আত্মনিয়োগ করব ঠিক করেছি। তুমি আমাদের সমিতির উদ্দেশ্যটা বেশ ভাল ক'রে গুছিয়ে লিখে দাও ছোটদা—দেবে ?

যতীন। তা না হয় দেব। কিন্তু জিনিসটা ভাল ক'রে ভেবে দেখা উচিত কিছু করবার আগে।

রুমি অধীরতাসূচক একটা ভঙ্গী করিল।

রুমি। ও ভাবাই আছে।

যতীন। ধর, যে সব মেয়ে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, তাদের ভরণ-পোষণের একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো ?

রুমি। নিশ্চয়। তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, উপার্জনের ব্যবস্থা থাকবে, রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে, তাদের প্রত্যেকের বিয়ের ব্যবস্থা করবে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলী। ছেলের বিয়ে দিতে হ'লে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই হুড়মুড় ক'রে মেয়ের বাপেরা ফোটোগ্রাফের বোঝা নিয়ে গিয়ে হাজির হবে না তখন, হ'লেও কোনও ফল হবে না। সকলকে ছেলের বিয়ের জন্যে যেতে হবে ওই প্রতিনিধিমণ্ডলীর কাছে। সেখানে কোনও রকম অসম্মানজনক প্রস্তাব করেন যদি কেউ, তা হ'লে সমস্ত বাঙালী মেয়ে 'স্ট্রাইক' করবে—সে ছেলের বিয়ে হবে না যতক্ষণ না সে ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

টিকটিকি। ঠিক, ঠিক সবই ঠিক। কেবল ওই রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারটায় একটু খটকা লাগছে। ও বিষয়ে বেশি কড়াকড়ি করতে গেলে অনেক মেয়ে পালাবে, আর ঢিলে দিলে অনেক মেয়ে কেলেঙ্কারি করবে। জানি তো সব…

টিকটিকির কথা রুমি শুনিতে পাইল না। যতীন পাইল।

যতীন। তোমার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাটা কি রকম হবে?

রুমি। [হাসিয়া] কারাগারে বন্দী ক'রে রেখে 'ফিডিং বট্‌লে' উপদেশ পান করিয়ে কতদিন আর বাঁচিয়ে রাখবে আমাদের? অন্ধকূপ হত্যা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ না? বাইরের আলো-বাতাসের অভাবে ভেপসে প'চে মলুম যে আমরা! তালাটা খুলে দিলে ক্ষতি কি?—দু-চারজন পথ হারিয়ে মরবে হয়তো—তা মরুক, অধিকাংশই কিন্তু বাঁচবে।

যতীন। তা হ'লে রক্ষণাবেক্ষণের কোনও প্রয়োজন নেই বলছ?

রুমি। বাইরে থেকে কেউ কি রক্ষণাবেক্ষণ করতে পেরেছে কখনও কাউকে? সিন্দুকের ভিতর বন্ধ ক'রে রেখেও পারে নি।

টিকটিকি। ঠিক ঠিক।

রুমি শুনিতে পাইল না, বলিয়া চলিল—

রুমি। সেই দৈত্যের গল্পটা ভুলে গেছ—সেই যে, একটা দৈত্য সিন্দুকের ভিতর একটা মেয়েকে পুরে মাথায় ক'রে নিয়ে বেড়াত?

যতীন। ও গল্প জানি, তোমার সঙ্গে আমার মতদ্বৈধও নেই—তোমার 'স্কীম'টা কি, তাই শুধু জানতে চাইছি। রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে বলছ, সেটা কি রকম হবে?

রুমি। মেয়েরা তাদের বাপ-মায়ের কাছেই থাকবে যেমন আছে, কেবল তাদের আমাদের সমিতিতে যোগ দিতে হবে এবং প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, বিয়ের ব্যাপারে অসম্মানজনক কোন কিছু তারা সহ্য করবে না। সমিতি তাদের সে বিদ্রোহ সমর্থন করবে। আমরা যেখানে যেমন দরকার শিক্ষার ব্যবস্থা করব, উপার্জনেরও ব্যবস্থা করব, কিন্তু ওই একটি শর্তে। বিয়ের ব্যাপারে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, প্রয়োজন হ'লে সে বিষয়ে কর্তৃত্ব করবে আমাদের প্রতিনিধিমণ্ডলী। মেয়েদের বাপ-মাকে নিয়েই প্রতিনিধিমণ্ডলী হবে অবশ্য।

যতীন। কিন্তু যাদের মেয়ে আছে, তাদের ছেলেও আছে। মেয়ের স্বার্থের কাছে ছেলের স্বার্থ বলি দিতে রাজি হবে কি সবাই ?

রুমি। আমার বিশ্বাস অনেকে হবে। ছেলেদের স্বার্থকে বলি দেব কেন আমরা ? তাদের স্বার্থ তো আমাদেরই স্বার্থ। সমাজ মেয়েদের উপর যে অত্যাচারটা করছে, সেইটে নিবারণ করাই শুধু আমাদের উদ্দেশ্য।

যতীন। ধর, যদি বাপ-মায়েরা রাজি না হয় ?

রুমি। তখন তাদের নিয়ে আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়বার চেষ্টা করতে হবে।

যতীন। তাতে কি পরিমাণ টাকার দরকার, তা ধারণা আছে তোর ?

রুমি। আছে, অনেক টাকার দরকার। কিন্তু সেই ভয়ে থামলে চলবে না। আরম্ভ করতে হবে।

যতীন। আমার বিশ্বাস, রাজশক্তি সাহায্য না করলে এক-আধ-জনের চেষ্টায় এ হওয়া অসম্ভব। বিদেশী রাজার কাছে সাহায্য পাওয়া যাবে না, আমাদের পঙ্গুতাই তার কাম্য। সুতরাং স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে সকলের আগে। দেশ স্বাধীন না হ'লে কিছুই হবে না।

রুমি। সে চেষ্টা তো চলছে, এটাও চলুক। না ছোটদা, তুমি ঝগড়া লাগাবার চেষ্টা করছ খালি। কোনও বাধা আমি মানব না।

যতীন। [হাসিয়া] কোনও বাধাই না ? ধর, যদি—

কথাটা বলিতে গিয়া যতীন থামিয়া গেল। সমরের সম্বন্ধে রুমির মন যে ব্যাঘ্রিণীর মত সজাগ, তাহা যতীনের জানা ছিল। সমরকে লইয়া কোনও রসিকতাও সে সহ্য করিবে না। কিন্তু যতীনের মনের ভাব তাহার চোখের দৃষ্টিতে মূর্ত হইয়া উঠিল। রুমির মনের ভাবও মূর্ত হইল রুমির চোখের দৃষ্টিতে।

যতীনের মনের ভাব। ধর্, যদি সমর এতে আপত্তি করে ?

রুমির মনের ভাব। সমর আপত্তি করবে ? সমরকে চেন না তামরা। সোনায় মরচে ধরতে শুনেছ কখনও ?

যতীনের মনের ভাব। শুনি নি, কল্পনা করছি। যদি আপত্তি চরে, কি করবি তখন তুই ?

রুমির মনের ভাব। সমরের মুখদর্শন করব না কখনও তা হ'লে।

মূর্ত মনোভাব দুইটি অদৃশ্য হইল। যতীন দেখিল, রুমি তাহার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার চোখের দৃষ্টিতে বহ্নি-দীপ্তি।

রুমি। কোনও বাধাই আমি মানব না ছোটদা। প্রাণ দিয়েও আত্মসম্মান রক্ষা করব।

যতীনের মনে হইল, রুমির সমস্ত দেহটাই যেন স্বর্ণ-শিখার মত জ্বলিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে শিখা আকাশবিসর্পী হইল—দিগ্-দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল অপূর্ব জ্যোতির্ময় দীপ্তিতে। সেই দীপ্তি ভেদ করিয়া ঝঞ্ঝার বেগে একটি অশ্ব যেন ছুটিয়া আসিতেছে···কাছে আসিয়া গ্রীবাভঙ্গী করিয়া অশ্বটি দাঁড়াইয়া পড়িল···যতীন সবিস্ময়ে দেখিল, অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রহিয়াছে মূর্তিমতী তেজঃস্বরূপিণী এক নারী···তাহার উত্তোলিত হস্তে তীক্ষ্ণ তরবারি···সে বলিতেছে, মেরি ঝান্সি নেহি দেউঙ্গি, নেহি দেউঙ্গি, নেহি দেউঙ্গি···। দৃশ্য মিলাইয়া গেল।

রুমি। আমি চললাম ছোটদা—লিখে রেখো, বুঝলে ? আমি আসব আবার।

যতীন। আচ্ছা।

রুমি চলিয়া গেল।

৬

টিকটিকি। নানা গোলমালে একটা কথা চাপা প'ড়ে গেছে।

যতীন। কি কথা ?

টিকটিকি। নীলার কথাটা। সে যে তোমাকে অক্ষম ব'লে অত বড় একটা বিদ্রূপ ক'রে গেল, সহ্য ক'রে থাকবে সেটা ? তুমি কি একটা কেউ-কেটা নাকি ! আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি, তোমার শক্তি কত !···

যতীন চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর চোখ বুজিয়া ভাবিবার চেষ্টা করিল, সত্যই কি তাহার কোন শক্তি আছে ? থাকিলে তাহা কিরূপ ?···চোখ খুলিয়া দেখিল, একটি কঙ্কাল সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

কঙ্কাল। আমিই তোমার শক্তি।

যতীন। তুমি !

কঙ্কাল। খেতে পাই না।

যতীন। কেন, আমি খাই তো। জীবনে কখনও খাওয়ার কষ্ট পেয়েছি ব'লে তো মনে পড়ে না।

কঙ্কাল। ওইখানেই তোমার ভুল। তুমিই তোমার শক্তি নও, সে রকম তপস্যা তোমার নেই। দেশের সম্মিলিত শক্তিই তোমার শক্তি···তোমার শক্তি···

কঙ্কালের দাঁতগুলা সহসা কড়মড় করিয়া উঠিল। অক্ষিকোটর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির হইল···

কঙ্কাল। তোমার শক্তি ? লজ্জা করে না বলতে ? এর মধ্যেই কি ক'রে ভুলে গেলে যে, তোমার শক্তি একমুঠো উচ্ছিষ্ট অন্নের জন্য মাথা কুটে মরেছে প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে, 'ফ্যান দাও' 'ফ্যান দাও' ব'লে হাহাকার ক'রে বেড়িয়েছে শহরের গলিতে গলিতে, পুলিসের গুলিতে মরেছে হাজারে হাজারে, ঝড়ে উড়ে গেছে, আগুনে পুড়ে গেছে, বানে

ডুবে গেছে ?···[করুণ কণ্ঠে] কিছু নেই—অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শিক্ষা নেই, আদর্শ নেই। সমস্ত নিয়ে গেছে। চামড়া ছিঁড়ে নিয়েছে, মাংস কেটে নিয়েছে, চোখ উপড়ে ফেলেছে। বাকি আছে শুধু হাড় কখানা···বাঁচাও এগুলোকে···এখনও এ দিয়ে বজ্র তৈরি হতে পারে।

যতীন। [সাগ্রহে] বল, কি উপায় তার ?

টিকটিকি। কি ভণ্ড, কিছু জানে না যেন !

কঙ্কাল। উপায়—ত্যাগ, স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ, ভালবাসা। শুধু নীলাকে ভালবাসা নয়, সকলকে ভালবাসা। সকলকে ভালবাসতে না পারলে নীলার ভালবাসাও টিকবে না। বিশাল হৃদয়ের বলিষ্ঠতাই নীলাকে নির্ভয় করতে পারে, বিশাল গাছের শাখাতেই পাখি নীড় বাঁধে, মাটির উপরই গৃহ নির্মিত হয়। তোমার উদারতার অভাব ঘটেছে ব'লেই দেশজোড়া এই অশান্তি, এই হানাহানি, তোমার সঙ্কীর্ণ প্রেমের ভিত্তিও ন'ড়ে উঠেছে তাই। বাঁচাও আমাকে—এখনও বাঁচাতে পার···বাঁচাও···বাঁচাও···

কঙ্কাল ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল। দূর হইতে কেবল শোনা যাইতে লাগিল, বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁচাও—

টিকটিকি। এই মরেছে !

যতীন। কি হ'ল ?

টিকটিকি। [সানুনয়ে] আমাকে চট ক'রে একটা গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, এক জোড়া বাটারফ্লাই গোঁফ, আর এক জোড়া গ্লেজ্‌ড্ কিড্‌সের পাম্পশু দিতে পার ? দাও ভাই চট ক'রে।

যতীন। [সবিস্ময়ে] কেন ?

টিকটিকি। ওই দেখ, টিকটিকিনীর কাণ্ড !

যতীন সবিস্ময়ে দেখিল, পাশের দেওয়ালে টিকটিকিনী সত্যই অদ্ভুতবেশে সাজিয়া আসিয়াছে। ঠোঁটে রঙ, মুখে পাউডার, পরনে

চটকদার হাওয়াই শাড়ি। আঁকিয়া বাঁকিয়া ওরিয়েণ্টাল নাচ নাচিতেছে।

টিকটিকি। দাও চট ক'রে—আদ্দির পাঞ্জাবি, বাটারফ্লাই গোঁফ আর ভাল একজোড়া পাম্পশু ; না হ'লে তো ওকে ভোলানো যাবে না। দাও না।

যতীন। আমার কাছে নেই।

টিকটিকি। আঃ, বিপদে ফেললে দেখছি। পাশের বাড়িতে থিয়েটারের আখড়া আছে না? সেখানে পাওয়া যেতে পারে, দেখি চেষ্টা ক'রে।

ত্বরিতপদে বাহির হইয়া গেল। টিকটিকিনীও নাচিতে নাচিতে তাহার অনুসরণ করিল। যতীন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' শব্দটা আবার শোনা গেল। স্পষ্টতর হইয়া ক্রমশ সেটা নিদারুণ হাহাকারে পরিণত হইল। সহসা খবরের কাগজের পাতা হইতে নোয়াখালি ও কলিকাতার অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের দল পিলপিল করিয়া বাহির হইয়া আসিল। মনে হইল, চতুর্দিক যেন ভরিয়া গেল। আকাশ লাল হইয়া উঠিয়াছে···ঘর পুড়িতেছে···গ্রাম পুড়িতেছে। বাঁচাও—বাঁচাও—কে কোথায় আছ, বাঁচাও···চীৎকার-ক্রন্দন-হাহাকারের মধ্যে কে যেন অট্টহাসি হাসিতেছে! যতীন এতক্ষণ প্রাণপণে যে বিভীষিকাকে নিজের মগ্নচৈতন্যের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহা অতিশয় নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। কাগজে পড়িয়া তাহার মনে যে কৌতূহলটুকু জাগিয়াছিল, তাহা এই বিরাট জনতায় দিশাহারা হইয়া গেল। তাহার ভয় করিতেছিল না, সে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। চতুর্দিকে জনতা, চীৎকার, হাহাকার, অট্টহাসি, আগুনের হলকা, শবদাহের গন্ধ আর ধোঁয়া। হঠাৎ সে দেখিতে পাইল, এক বিরাট পুরুষ ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছেন···যতীনের

একটা ছবি মনে পড়িয়া গেল···যেন লিলিপুট-জনতার মধ্যে গালিভার আবির্ভূত হইয়াছেন। বিরাট পুরুষ অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

বিরাট পুরুষ। বিভ্রান্ত হ'য়ো না, এর স্বরূপ বাইরে থেকে অমন এলোমেলো ক'রে দেখলে ঠিক বোঝা যাবে না। ঠিক ক'রে দিচ্ছি, দাঁড়াও।

যতীন। আপনি কে?

বিরাট পুরুষ। আমি ইতিহাস।

ইতিহাস জনতার মধ্যে কি যে করিলেন, যতীন ঠিক বুঝিতে পারিল না; কিন্তু অদ্ভুত একটা রূপান্তর ঘটিল। জনতার বিশৃঙ্খলা আর রহিল না। ···এক ধারে কতকগুলি বন্দিনী নারী সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে ···মানুষ নয়, যেন প্রাণহীন নিস্পন্দ পুতুলের সারি—চোখের দৃষ্টিতে ভাষা নাই, সজীব আতঙ্কও নাই, সমস্ত জমিয়া যেন পাথর হইয়া গিয়াছে···আর এক ধারে বন্দী পুরুষের দল···মৌন ঘৃণা আর ভয় তাহাদের চোখের দৃষ্টিতে মূর্ত হইয়া আছে···দুই দলের মধ্যে কয়েকটি শিশু···কিছু দূরে নরমুণ্ড ও কবন্ধের স্তূপ···তাহারই পাশে একটা অগ্নিকুণ্ড দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহাতে পুড়িতেছে একটা জীবন্ত মানুষ···আর এই সমস্তটা স্পর্ধিত নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছে একটা অদ্ভুত পশু। পশুটার আকৃতি ভয়াবহ। মুণ্ডটা হায়েনার, বীভৎস দাঁতগুলা রক্তাক্ত। হাত দুইটা হাত নয়, সাপ। আঙুল নাই, আঙুলের স্থানে ফণা। বুকটা যেন শ্যাওলা-ধরা পাথর, তাহার উপর অসংখ্য শুঁয়া-পোকা সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। পা দুইটাও মানুষের নয়, শ্বাপদের। মাথায় একটা লোহার হেলমেট। কোমরে একটা ছোরা গোঁজা। অস্পষ্ট দুইটি মূর্তি নেপথ্যে বন্দুক কাঁধে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে··· মনে হইতেছে, তাহারা যেন এই

পশুটার দেহরক্ষী। ইতিহাস কখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন যতীন বুঝিতে পারে নাই।···পশুটা আগাইয়া আসিয়া বন্দী নর-নারীদের মধ্যস্থলে কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইল। দুইটা সাপের ফণা দুই দিকে উদ্যত হইয়া রহিল।

পশু। তোরা মানবি কি না এখনও বল্··· যদি মানিস জিন্দা থাকবি, আর যদি না মানিস—

শ্বাদন্ত নিষ্কাশিত করিয়া ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি করিল একটা। সর্পরূপী বাহু-যুগল কুঞ্চিত প্রসারিত হইতে লাগিল। চোখের দৃষ্টি হইতে আগুন নয়, খানিকটা পুঁজ যেন গলগল করিয়া বাহির হইয়া আসিল।···

পশু। [সগর্জনে] মানবি কি না বল্, জলদি বল্, (পুরুষদের দিকে চাহিয়া) জলদি।

একজন পুরুষ। না, মানব না।

পশুটা হাসিয়া উঠিল? অদ্ভুত সে হাসি! কোন শব্দ হইল না। মুখ-গহ্বরটা কান পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গেল কেবল।

পশু। [সহসা উচ্চৈঃস্বরে] এই, আয় তোরা।

সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা পশু ছুটিয়া আসিল। কাহারও মুণ্ড শৃগালের মত, কাহারও কুকুরের মত, কাহারও শকুনির মত···।

পশু। নিয়ে আয় মাংস আর রক্ত।

একজন গিয়া মাংস ও রক্ত লইয়া আসিল।

পশু। খাওয়া এই ব্যাটাকে··· শালা, হারামির বাচ্চা···

যে পুরুষটি আপত্তি করিয়াছিল, তাহাকে সকলে মিলিয়া জোর করিয়া মাটিতে ফেলিল এবং মাংস ও রক্ত মুখে পুরিয়া দিল।

পশু। এইবার মার্ জুতো শালার মুখে।

মুখে জুতা মারা হইল।

পশু। কাট্ এবার।

কাটিল। তাহার মাথাটা পিছন দিকে ঝুলিয়া পড়িতেই ছিন্ন শিরামুখ হইতে ফিনকি দিয়া রক্তের ফোয়ারা ছুটিয়া বাহির হইল। ওঃ—ওঃ—ওঃ—ওঃ—ভগবান— বন্দিনী মেয়েদের মধ্যে একজন হাহাকার করিয়া উঠিল। নিহত ব্যক্তি তাহারই স্বামী। মেয়েটির চীৎকারে যতীন আত্মস্থ হইল, এতক্ষণ তাহার চিত্ত যেন অসাড় হইয়া গিয়াছিল—সেও চীৎকার করিয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া বারণ করিল। কিন্তু কোন ফল হইল না। পশুরা তাহাদের কাজ ঠিক করিয়া যাইতে লাগিল। জননীদের আর্তনাদ অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা শিশুদের মধ্যে কাহাকেও অগ্নিকুণ্ডে ছুঁড়িয়া দিল, কাহাকেও আছড়াইয়া মারিল, কাহারও দুই পা ধরিয়া চিরিয়া ফেলিল। যতীন আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না—সে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। পশুরা নির্বিকার। যে বন্দিনী হাহাকার করিয়া উঠিয়াছিল, একটা পশু তাহার দিকে চাহিয়া একটা পৈশাচিক হাসি হাসিল। এ হাসি নিঃশব্দ নয়—মনে হইল, গলার ভিতর খলবল করিয়া জল ফুটিতেছে।

বন্দিনী। আমাকেও মেরে ফেল তোমরা…আমাকেও মার… তোমাদের পায়ে পড়ছি, দয়া ক'রে আমাকে মার…আমার ছেলেকে মেরেছ, স্বামীকে মেরেছ…আমাকেও মার…

পশু। তোমাকে মারব না সুন্দরী, অঙ্কশায়িনী করব…

বন্দিনী। না—না—না—

পশু। না বললে শুনছে কে! ওরে, ধর্‌—

কয়েকজন পশু আসিয়া মেয়েটিকে চিত করিয়া মাটিতে ফেলিল। একজন আগাইয়া গিয়া পা দিয়া তাহার মাথায় আঘাত করিল, হাত ভাঙিয়া দিল। তাহার পর তাহার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গেল। ক্ষণপরেই ধর্ষিতা নারীর হাহাকারে চতুর্দিক শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। নেপথ্যে যে দুইটি অস্পষ্ট মূর্তি বন্দুক কাঁধে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা নির্বিকারভাবে দাঁড়াইয়াই রহিল।···যতীনের হস্ত মুষ্টিবদ্ধ, নাসারন্ধ্র স্ফীত, চক্ষু রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া তারস্বরে আবার সে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল। কিন্তু পশুদের কার্যকলাপে এতটুকুও ছেদ পড়িল না। বরং তৎক্ষণাৎ তাহারা আর একটি মেয়ের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। যতীন আর দেখিতে পারিতেছিল না, বুকফাটা হাহাকার শোনাও আর সম্ভব ছিল না তাহার পক্ষে। নিরুপায় হইয়া সে চোখ বুজিয়া কানে আঙুল দিল···কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে আবার চোখ খুলিল। দেখিল, ইতিহাস তাহার সম্মুখে পুনরায় মূর্ত হইয়াছেন।

ইতিহাস। কেন বৃথা চীৎকার করছ?

যতীন। মেয়েদের এই নির্যাতন চুপ ক'রে দেখব? কি বলছেন আপনি!

ইতিহাস। [হাসিয়া] মেয়েদের নির্যাতন চুপ ক'রে দেখাই তো তোমাদের অভ্যাস।

যতীনের চোখের সম্মুখে নূতন দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইল। চিতা জ্বলিতেছে। চিতায় পুড়িতেছে একটি মৃত পুরুষের সহিত একটি জীবন্ত নারী। মেয়েটি

হাত জোড় করিয়া মৃত স্বামীর পা দুইটা মনে মনে জড়াইয়া ধরিয়া নিদারুণ যন্ত্রণাটা ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না; চেষ্টা সত্ত্বেও মুখ দিয়া আর্তনাদ বাহির হইয়া পড়িতেছে। সে আর্তনাদকে চাপা দিয়া গর্জন করিয়া উঠিতেছে ঢাক ঢোল দামামা রামশিঙার তুমুল নির্ঘোষ। এ দৃশ্য অবলুপ্ত হইয়া গেল, আর একটা দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল …একসঙ্গে শত শত নারী সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া হাতের শাঁখা ভাঙিয়া বৈধব্য-বেশ ধারণ করিতেছে—একটিমাত্র কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যুতে এতগুলি মেয়ে পতিহীনা হইয়াছে, অদূরে নিষ্ঠুর-মূর্তি একটা পাণ্ডা দাঁড়াইয়া আছে, সকলের টুঁটি টিপিয়া জোর করিয়া নির্জলা একাদশী করাইবে।…এ দৃশ্য মিলাইয়া গেল, আর একটা মূর্ত হইল। পর্তুগীজ বণিকের জাহাজে সারি সারি মেয়ের দল উঠিতেছে, প্রত্যেকের কোমরে দড়ি। পর্তুগীজ বণিকেরা উহাদের কাহাকেও লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছে, কাহাকেও কিনিয়াছে।…জাহাজ ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইল একটি নৌকায়। নৌকার গলুইয়ের উপর ম্লানমুখী একটি কিশোরী বসিয়া আছে—ভরার মেয়ে…ভরার মেয়ে দেখিতে দেখিতে রূপান্তরিত হইল স্নেহলতায়…স্নেহলতার সর্বাঙ্গে আগুনের শিখা… স্নেহলতাকে দগ্ধ করিয়া আগুনের শিখা ধীরে ধীরে স্তিমিত হইয়া আসিল…সেই স্তিমিত আলোকে যতীন দেখিতে পাইল, প্রেতিনীর মত সারি সারি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে পণ্য-রমণীর দল…তাহাদের নিষ্পলক দৃষ্টিতে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ…এ দৃশ্যও ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল… যতীন দেখিল, ইতিহাস তাহার দিকে চাহিয়া আছেন।

যতীন। অতীতে কিছু করি নি ব'লে বর্তমানেও চুপ ক'রে থাকব, এ আপনার কেমন যুক্তি?

ইতিহাস। বর্তমানেও তোমরা চুপ ক'রে আছ। ওই দেখ।

অশরীরী নিভাননী ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল। চোখের দৃষ্টিতে সপ্রতিভ ছদ্ম হাসি।

নিভাননী। [হাসিয়া] আমার উপর করুণা প্রকাশ ক'রে কেন যে সময় নষ্ট করছ, বুঝি না। আমার কোন দুঃখ নেই, তোমরা আমার দুঃখটা বুঝলে না, কিন্তু স্বয়ং বাবা বিশ্বেশ্বর আমাকে পায়ে ঠাঁই দিয়েছেন। বরং তোমাদের কথা ভেবেই দুঃখ হয় আমার···ঠিক আমার বিশুর মতই অবুঝ তোমরা···ওই যে আসছে—আর পারি না ওকে নিয়ে।

অশরীরী বিশু আসিয়া প্রবেশ করিল। মাথার চুল অবিন্যস্ত, পরিধানে ময়লা হাফপ্যান্ট, ছেঁড়া কামিজ। চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। গালের উপর অশ্রুর ধারা শুকাইয়া রহিয়াছে। নিভাননীকে দেখিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু বলিল না, কেবল নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল।

নিভাননী। আচ্ছা, তুই অমন করছিস কেন বল্ দিকি ?

বিশু। [অস্ফুটকণ্ঠে] মা!

তাহার দুই চোখ আবার জলে ভরিয়া উঠিল।

নিভাননী। কতবার বোঝাব তোকে! এ কি আমার নতুন হয়েছে, এ রকম অদ্ভুত কাণ্ড কতবারই তো হয়েছে পৃথিবীতে মহাভারত খুলে দেখ্ না। বিনতার দুই ছেলে অরুণ আর গরুড় জন্মেছিল ডিম থেকে, গান্ধারী প্রসব করেছিলেন একটা মাংসপিণ্ড, সেটা ঘৃতকুণ্ডে রাখবার পর তবে তার থেকে শত পুত্র জন্মাল, দ্রোণও জন্মেছিল কলসী থেকে, শরস্তম্ভ থেকে কৃপ কৃপী, আগুন থেকে অগ্নিবেশ, দ্রৌপদী, ধৃষ্টদ্যুম্ন···রামায়ণ পড়েছিস তো—সীতা মাটি থেকে জন্মায় নি ?—কি অবুঝ ছেলে বাবা, কিছুতেই বুঝবে না—চল্—

বিশুকে নিভাননী টানিতে টানিতে লইয়া চলিয়া গেল।

অশরীরী মেজদি প্রবেশ করিলেন।

মেজদি। কাণ্ডখানা দেখে এস একবার। তোমার মেজদা পা ছড়িয়ে ব'সে আছেন, আর ওই বিধবা বউ তাঁর উরুতে গরম তেল মালিশ করছে। আচ্ছা, এমন অনাছিষ্টি কাণ্ড শুনেছ কখনও? পুত্রবধূ অবশ্য মেয়ের মত তা মানি, কিন্তু সোমত্ত মেয়েকে দিয়েও কেউ উরুতে তেল মালিশ করায় নাকি? আমি মালিশ ক'রে দিতে গেলুম, তোমার মেজদা বললেন, তোমার হাতে জোর নেই, তুমি পারবে না। মানে মানে স'রে এলুম—নিজের মান নিজের কাছে—অ্যাঁ, কি বল? কিন্তু এমন অনাছিষ্টি কাণ্ড বাপের জন্মে শুনি নি কখনও বাপু!

দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। একবার অসহায়ভাবে এদিক ওদিক চাহিলেন। তাহার পর নাক কুঁচকাইয়া চশমাটা ঠিক করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

মেজদি। আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, কতটুকুই বা বুঝি, কিই বা জানি! [একটু হাসিয়া] আর এটাও ঠিক, হাতে কিছু জোর নেই আমার—কিচ্ছু না। সর্বাঙ্গ কেমন যেন অবশ হ'য়ে আসছে দিন দিন—একটু জোরে মালিশ ক'রে না দিলে কামড়ানি কমবেই বা কেন? [পুনরায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া] যাই, তেলটুকু নিয়ে আসি, জীবু দোকান বন্ধ ক'রে দেবে আবার—তেলের শিশিটা সকাল থেকে তার দোকানে প'ড়ে আছে—অন্ধকারও হয়ে এল···যাই।

চলিয়া গেলেন। একটি সিনেমা-অভিনেত্রী ধীরে ধীরে ছায়ালোক হইতে নামিয়া আসিলেন। অদ্ভুত রূপসী। অভিনয়ের সময়ে যতীন ইহাকে অনেকবার দেখিয়াছে। চোখে-মুখে-কথা চটপটে চটুলা—যতীনের ইহাই ধারণা ছিল। এখন দেখিল, তাহার চোখের দৃষ্টি বড় করুণ।

সিনেমা-অভিনেত্রী। আমার শিল্প-চর্চার অন্তরালে কি শোচনীয় অপমান—কি নিদারুণ বেদনা যে প্রচ্ছন্ন আছে, তা যদি দেখতে পেতে!

সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাশে একটি লোলচর্ম লোলুপদৃষ্টি বৃদ্ধ মূর্ত হইল। গায়ের শাল এবং হাতের আংটি দেখিয়া মনে হয়, লোকটার আর কিছু না থাক্‌, টাকা আছে।

বৃদ্ধ। কি করছ এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

অভিনেত্রী। [অনুযোগভরা আবদারমাখা কণ্ঠে] তোমার জন্যেই তো অপেক্ষা করছি কতক্ষণ থেকে!

বৃদ্ধ। ও। চল তা হ'লে—এই ভূপৎ সিং…

নিঃশব্দে প্রকাণ্ড একখানা মোটরকার আসিয়া দাঁড়াইল। অভিনেত্রীকে লইয়া বৃদ্ধ তাহাতে প্রবেশ করিলেন। মোটর অন্তর্হিত হইল…ধীরে ধীরে এবং অনিবার্যভাবে আর একটা দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। ছোট একখানি ঘর। দেখিলে মনে হয়, কিছুক্ষণ আগেই তাহাতে লক্ষ্মী-শ্রী ছিল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাব এখনও আছে; কিন্তু ঘরের চতুর্দিকে জিনিসপত্র ছড়ানো। ঘরের এক কোণে একটা তোলা উনুনে ভাত ফুটিতেছে। ঘরের মেঝেতে হাত-পা-বাঁধা একটি নারী, তাহার পাশেই হাত-পা-বাঁধা একটি পুরুষ। পুরুষটির গায়ে মাথায় তেল দেখিয়া মনে হয়, সে বোধ হয় স্নান করিতে যাইতেছিল। সেই পশুটা আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

পশু। কি ঠিক করলি?

নারী। [করুণ কণ্ঠে] ও জ্বরে ভুগছিল, তিন দিন খায় নি কিছু। আজ পথ্য করবে চারটি। ভাত হয়ে গেছে, আগে ওবে খেতে দাও তোমরা, তারপর সব হবে।

পশু। [পুরুষকে] আমার কথা মানবি কি না?

পুরুষ। না।

পশুটা তাহার মুখে থুতু দিল, লাথি মারিল। ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া শেষে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িটা তুলিয়া সমস্তটা তাহার মুখের উপর উপুড় করিয়া দিল।

যতীন। এই—এই—এই—কি করছ তুমি?

পশুটা যতীনের কথায় কর্ণপাত করিল না। মেয়েটার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিতে টানিতে বাহির হইয়া গেল।

ইতিহাস। তুমি বৃথা চীৎকার ক'রে মরছ। ও তোমার একটি কথা শুনতে পাচ্ছে না।

যতীন। শুনতে পাচ্ছে না!

ইতিহাস। না।

যতীন। শুনতে না পাবার কারণ?

ইতিহাস। কারণ ও মানুষ নয়, যন্ত্র। তুমি মাথা খুঁড়ে মরলেও ও থামবে না, থামবার শক্তিই নেই ওর। তোমার ঘড়িতে এখন পাঁচটা বেজেছে, ধর, কেউ যদি কাঁটা সরিয়ে ছটো ক'রে দিত, আর তুমি যদি ঘড়ির দিকে চেয়ে ক্রমাগত চীৎকার ক'রে যেতে—এখন ছটো নয়, পাঁচটা বেজেছে, কি করছ তুমি? তা হ'লে তা যেমন হাস্যকর হ'ত, তোমার এ চীৎকারও তেমনই হাস্যকর।

যতীন। কিছু করা যাবে না তা হ'লে?

ইতিহাস। যাবে, যে হাতটা ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়েছে, সেই হাতটাকে যদি প্রভাবিত করতে পার, কিংবা ঘড়িটা নিজের আয়ত্তে এনে নিজেই যদি কাঁটা ঘুরিয়ে ঠিক ক'রে দাও, তা হ'লে যাবে।

যতীন। তার উপায় কি?

ইতিহাস। উপায় বার করবে তোমরা। [হাসিয়া] আমি শুধু তার বিবরণটা সংগ্রহ ক'রে রেখে দেব, যেমন রেখে আসছি বরাবর। আমার প্রাচীন অভিজ্ঞতার ছবি দেখাতে পারি খানিকটা, দেখ, তার থেকে যদি বার করতে পার কিছু।

যতীনের চোখের সম্মুখে পর পর ছবির পর ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। শতদ্রু নদীর তীর, মহাবীর আলেকজাণ্ডারের অসংখ্য অশ্বারোহী সৈন্য সমাবিষ্ট হইয়াছে··· মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক শিবিরে সমর-কৌশল শিখিতেছেন··· বাংলা দেশে গঙ্গারাঢ়ীদের বিরাট হস্তি-বাহিনী সজ্জিত হইতেছে···'বৈদিক সভ্যতা তখনও অবলুপ্ত হয় নাই··· গঙ্গার তীরে তীরে মহাসমারোহে তখনও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে··· যজ্ঞাগ্নি ধীরে ধীরে মন্দীভূত হইল....রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গোপনে গৃহত্যাগ করিতেছেন··· বোধিদ্রুমমূলে অমিতাভ বুদ্ধ··· পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সারা ভারতবর্ষ যেন স্বপ্ন দেখিতেছে.... বৌদ্ধ শ্রমণ, বৌদ্ধ বিহার, বৌদ্ধ রাজা··· অশোকের সাম্রাজ্য··· আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী··· গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও, সত্যনিষ্ঠ হও, অহিংস হও—সর্বত্র এই বাণী প্রচারিত হইতেছে—সুদূর দাক্ষিণাত্যে তাম্রপর্ণী নদীর তীরেও··· সিংহলে, গ্রীসে, ঈজিপ্টে, সিরিয়ায়··· ধীরে ধীরে অন্ধকার নামিতেছে··· অশোকের বিশাল সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে ভাঙিয়া পড়িতেছে··· বিন্দুসার অযোগ্য পুত্র··· চারিদিকে বিশৃঙ্খলা···বিরাট সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল··· বৃহদ্রথকে তাহার ব্রাহ্মণমন্ত্রী পুষ্যামিত্র হত্যা করিয়া সুঙ্গ সাম্রাজ্য স্থাপন করিতেছে··· তাহার পর কাণ্ব, তাহার পর অন্ধ্র.... বাহিরের শত্রু আক্রমণ করিল··· গ্রীক, তাহার পর শক্, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তক্ষশিলায় পার্থিয়ান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল। শকেরা উজ্জয়িনী অধিকার করিয়াছে··· সমস্ত ভাসিয়া গেল কুশান-আক্রমণের বন্যা-বিপ্লবে··· হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া দলে দলে ছুটিয়া আসিতেছে

কুশান অশ্বারোহীরা··· গান্ধার, তক্ষশিলা, পাঞ্জাব, ক্রমে ক্রমে সব গেল··· নর্মদার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইল কুশান সাম্রাজ্য··· তৃতীয় কুশান সম্রাট কণিষ্ক কিন্তু আর অশ্বারোহী দস্যু নন···তিনি ভারতবর্ষীয় সম্রাট··· সর্বধর্মসমন্বয় করিতে ব্যস্ত···জরথুস্ত্র, হিন্দু, গ্রীক, পারস্য সকলের দেবতাই তাঁহার আরাধ্য··· কিন্তু শেষ বয়সে তিনি বুদ্ধের শরণ লইতেছেন··· রাজধানী পুরুষপুর বৌদ্ধমন্দিরে অলঙ্কৃত হইতেছে··· কাশ্মীরের কুন্তলবনে মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থ তাম্রলিপিতে খোদিত হইয়া স্তূপ-মধ্যে রক্ষিত হইতেছে··· বৌদ্ধ সম্রাট কণিষ্কের যুদ্ধপিপাসা কিন্তু মেটে নাই···সারাজীবন ধরিয়া তিনি যুদ্ধই করিতেছেন··· কাশগড়, খোটান, ইয়ারখণ্ড, চীন···কণিষ্কের সৈন্যেরা সর্বত্র বিজয়পতাকা হস্তে বিরাজমান··· যুদ্ধের জ্বালায় পাগল হইয়া শেষে তাঁহার সেনাপতিরা কণিষ্ককে গলা টিপিয়া হত্যা করিল··· কোলাহল, অন্তর্দ্বন্দ্ব, অন্ধকার··· একশতাব্দীব্যাপী অন্ধকার.... ধীরে ধীরে অন্ধকার আবার স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে··· চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তসাম্রাজ্য স্থাপন করিতেছেন··· লিচ্ছবি-রাজকুমারী কুমারা দেবীর যোগ্য সন্তান সমুদ্রগুপ্তের কিরণে সমস্ত ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত··· তিনি শুধু সম্রাট নন, তিনি কবি, পণ্ডিত, সুরশিল্পী··· দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত··· কুমারগুপ্ত··· স্কন্দগুপ্ত···ফাহিয়ান ভারত ভ্রমণ করিতেছেন··· অজন্তার গুহায় শিল্পীরা প্রাচীর-চিত্রণে রত··· হুন দস্যুরা ভারত আক্রমণ করিল··· গুপ্তসাম্রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত সৌন্দর্য অবলুপ্ত হইয়া যাইতেছে··· দস্যু তোরমানা মহারাজাধিরাজ হইলেন···. তাহার পর মিহিরগুলা··· মালবের অধিপতি যশোধর্মণ মগধের অধিপতি বালাদিত্যের সহিত মিলিত হইয়া মিহিরগুলাকে পরাজিত করিলেন··· তাহাকে বন্দী করিলেন, কিন্তু হত্যা করিলেন না··· মিহিরগুলা কাশ্মীররাজের আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে··· বিশ্বাসঘাতক মিহিরগুলা··· কাশ্মীর-সিংহাসন অধিকার করিল··· হাহাকারে চতুর্দিক পূর্ণ··· মিহিরগুলার অত্যাচারে বুদ্ধ-শ্রমণ-শ্রমণীরা সন্ত্রস্ত··· বৌদ্ধ স্তূপ, বৌদ্ধ মন্দির ভাঙিয়া পড়িতেছে

…হূন-প্রতাপ নির্বাপিত হইয়া আসিল… দস্যু হূন অবলুপ্ত হইয়া রূপান্তরিত হইল ভারতবর্ষের রাজপুত জাতিতে… হর্ষবর্ধন… গৌড়াধিপতি শৈব রাজপুত্র শশাঙ্ক থানীশ্বররাজ বৌদ্ধ হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন…হিউয়েন সাং… তাহার পর অন্ধকার… আবার যুদ্ধ… যুদ্ধ… গৃহবিবাদ… চীৎকার… হাহাকার…আবার আলো… বিরাট জনতা এক বিরাট সিংহাসন মাথায় করিয়া বহিয়া আনিতেছে…সিংহাসনের উপর প্রজা-নির্বাচিত রাজা গোপালদেব… ধর্মপাল দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছেন… দেবপাল…তাহার পর আবার অন্ধকার… কাবুলে শাহী-বংশীয় জয়পাল মাথা তুলিতেছে… সবুক্তগীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল… চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়িয়াছে… কাণ্যকুব্জ চৌহান চন্দেল্ল সকলে ছুটিয়া আসিতেছেন… সবুক্তগীনকে কিন্তু রোধ করা গেল না…সিন্ধুনদের তীরে তীরে সবুক্তগীনের বিজয়-পতাকা উড়িতেছে… গজনী হইতে ছুটিয়া আসিল আর এক দস্যু… সুলতান মামুদ… আবার জয়পাল তাহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন …পারিলেন না… ক্ষোভে অপমানে তিনি স্থির করিতেছেন—প্রাণ দিব, কিন্তু মান দিব না… জীবন্তে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিলেন… সুলতান মামুদের লুণ্ঠন-লিপ্সা মিটিল না… বারম্বার আসিতেছে… বারম্বার আক্রমণ করিয়া হত্যায় লুণ্ঠনে ধ্বংসে বিচূর্ণিত দেব-মন্দিরে ভারতবর্ষে মুসলমান-বিদ্বেষ বপন করিয়া যাইতেছে… মুলতান, থানেশ্বর, সোমনাথ সব গেল… সুলতান মামুদের সৈন্যবাহিনী হইতে সহসা একটি লোক বাহির হইয়া আসিলেন। যোদ্ধা নয়, পণ্ডিত। যতীনের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন…

যতীন। কে আপনি ?

লোকটি। আমার নাম আলবেরুনি। একটিমাত্র খবর দিতে চাই কেবল। সে সময় তোমাদের দেশে সাহিত্য-দর্শন খুব উঁচুদরের ছিল…কিন্তু একটা কি জিনিস দেখেছিলাম জান ? তোমরা মানুষের

মধ্যে 'ম্লেচ্ছ' আবিষ্কার করেছ। বিদেশী ছুঁলে জল তো বটেই, আগুনও অপবিত্র হয়ে যেত। কি ভয়ানক!

আলবেরুনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আবার ছবির মিছিল শুরু হইল। ···বৃদ্ধ দীপঙ্কর অতীশ হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া তিব্বতে চলিয়াছেন··· বঙ্গদেশে সেন-বংশ রাজত্ব করিতেছে··· কর্ণাটের সেন-বংশ বাংলায় আসিয়া বৌদ্ধ-দলনে নিযুক্ত··· বিজয় সেন···বল্লাল সেন···কাণ্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়া কৌলিন্য স্থাপন করিলেন··· অন্ধকার··· লক্ষ্মণ সেন··· বাংলায় পাঠান সৈন্য প্রবেশ করিতেছে···সপ্তদশ অশ্বারোহীর পুরোভাগে বক্তিয়ার খিলিজি··· খিলিজিবংশের রাজত্ব শুরু হইয়া গেল··· পিতৃব্যরক্তরঞ্জিত হস্তে আলাউদ্দিন খিলিজি সিংহাসনে আরোহণ করিল··· গুজরাটের রাণী কমলা দেবী বন্দিনী হইয়া আলাউদ্দিনের হারেম-কারাগারে প্রবেশ করিতেছেন···রূপসী হিন্দুনারীর লোভে পাঠান পাগল হইয়া উঠিয়াছে··· মেবার আক্রমণ করিল··· চিতোরে দলে দলে মেবারী সৈন্য প্রাণ দিতেছে···একজন পুরুষ বাঁচিয়া থাকিতে তাহারা চিতোরে পাঠানকে প্রবেশ করিতে দিবে না··· গোরা কিশোর বাদলও সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ দিল···কিন্তু চিতোর রাখিতে পারিল না···পাঠান সৈন্য অগণিত—চিতোরে প্রবেশ করিয়া আলাউদ্দিন দেখিল, পদ্মিনী নাই··· দাউদাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে···জহর-ব্রতের জহর খিলিজি-বংশকে ছারখার করিয়া দিল··· পদ্মিনীর চিতার আগুনই যেন লেলিহান শিখায় মূর্ত হইল তৈমুরলঙ্গে··· চতুর্দিক শবাকীর্ণ···নরমুণ্ডের পাহাড়··· রক্ত-কর্দমে দিল্লীর সুলতান-বংশ ধরাশায়ী···রাজ গণেশ মাথা তুলিয়াছেন··· খ্রীষ্টান ইউরোপীয় বণিকেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল··· পর্তুগীজ জলদস্যুরা অত্যাচার করিয়া বেড়াইতেছে···লোদী-বংশ···তাহাও বেশি দিন টিকিল না··· পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী বাবরের নিকট পরাজিত হইল··· মোগল সাম্রাজ্য··· হুমায়ুন··· শের শাহ··· হুমায়ুন নিজ ভ্রাতা

কামরানের চক্ষু উৎপাটন করিতেছেন··· আকবর···আকবরের রাজ্য-বিস্তার··· বাংলার পাঠান-নায়ক হিমু পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আকবরের নিকট পরাজিত হইলেন—বৈরামের হস্তে তাঁহার মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হইতেছে··· গুজরাট, খাণ্ডোয়ানা, আহমদ-নগর, অম্বর, সব গেল··· অম্বরপতি ভগবানদাস সম্রাট আকবরের শ্যালক হইলেন··· তাঁহার পুত্র মানসিংহ হইলেন যুবরাজ সেলিমের শ্যালক। পাহাড়ের মত মাথা উঁচু করিয়া রহিলেন কেবল উদয়পুরের রাণা প্রতাপসিংহ··· আকবরের খুশরোজ···সম্ভ্রান্ত হিন্দু-পুরনারীরা আকবরের উদ্যান-উৎসবে সমবেত হইতেছেন··· সেলিম জাহাঙ্গীর হইল··· বর্ধমানের শের আফগান···স্বামী-হন্তা জাহাঙ্গীরের পাশে নূরজাহান শোভা পাইতেছেন··· ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেম্‌সের দূত সার্ টমাস রো জাহাঙ্গীরের সভায় আসিয়াছেন··· শাহজাহান···নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খসরুর চক্ষু উৎপাটন করিয়া পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন···কনিষ্ঠ ভ্রাতা শারিয়রও রক্ষা পাইলেন না··· ইংরেজ বণিক হুগলিতে কুঠি স্থাপন করিতেছে··· ময়ূর-সিংহাসন··· তাজমহল··· ভ্রাতৃরক্তে স্নান করিয়া বন্দী পিতার চোখের সামনে ঔরঙ্গজেব ময়ূর-সিংহাসন দখল করিতেছেন···এক হাতে কোরাণ আর-এক হাতে কৃপাণ··· জিজিয়া কর পুনরায় প্রবর্তিত হইতেছে··· পর্বতের শিখরে শিখরে গৈরিক পতাকা উড়িতেছে··· মহারাষ্ট্রবীর ছত্রপতি শিবাজী মাথা তুলিয়াছেন···অশ্বারোহণে চতুর্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন··· ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে গেলেন···দাক্ষিণাত্যেই তাঁহাকে শেষ-শয্যা পাতিতে হইল··· মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হইয়া আসিতেছে··· নাদির শাহ···দিল্লীর লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড···সারি সারি মৃতদেহ···সারি সারি উট চলিয়াছে···বহু অশ্ব···কাতারে কাতারে গাড়ি··· ময়ূর-সিংহাসন, কোহিনূর, কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা—ভারতবর্ষের বিপুল ঐশ্বর্য নাদির শাহ বহিয়া লইয়া চলিয়াছে··· মারাঠার অভ্যুদয়··· পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ··· সারি সারি তিন শত তোপ, দ্বাদশ সহস্র তোপরক্ষক·

তাহার পিছনে চল্লিশ সহস্র ভোঁসলে, বিংশ সহস্র আরব, ত্রিশ সহস্র হাবসি, চল্লিশ সহস্র পাঠান, জাঠ, রোহিলা, সিন্ধি, জাদব, বহু রাজপুত, জপ্‌কোজি সিন্ধিয়া এবং মহল্লর রাও হোলকারের নেতৃত্বে আহমাদ শাহ দুরানির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান···মধ্যস্থলে সেনাপতি ভাউসাহেব···ঈর্ষাদগ্ধ বিশ্বাসঘাতক বলবন্ত রাও সেঁচলের চোখে পৈশাচিক হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে··· মহারাষ্ট্রশক্তির পরাজয় ঘটিল··· আবার অন্ধকার···ইংরেজ বণিকের দল···ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি···ফরাসী বীর ডুপ্লে··· প্রথম কর্ণাট যুদ্ধ···দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ···রবার্ট ক্লাইভ···সিরাজদ্দৌলা··· মীরজাফর···পলাশীর যুদ্ধ···ওয়ারেন হেস্টিংস···নন্দকুমারের ফাঁসি··· লর্ড ডালহৌসি···দেখিতে দেখিতে সব লাল হইয়া গেল···সিপাহী-বিদ্রোহ··· রুটি ও লালপদ্ম··· সিপাহী-বিদ্রোহের অবসান ঘটিল··· ইংরেজের ভীষণ প্রতিশোধ··· বিশেষ করিয়া মুসলমানদের উপর অত্যাচার···দিল্লীর হত্যাকাণ্ড নির্মমতায় নাদির শাহকে অতিক্রম করিল··· সুরেন বাঁড়ুজ্জে···কংগ্রেস···বঙ্গবিচ্ছেদ···সাগ্নিক বিপ্লবীর দল··· এক হাতে গীতা, আর-এক হাতে বোমা··· সারি সারি ফাঁসি-কাঠে অসংখ্য মড়া ঝুলিতেছে··· অরবিন্দ, সুভাষ বসু, চিত্তরঞ্জন··· জালিয়ানওয়ালাবাগ···বুকে হাঁটিয়া সকলকে পথ অতিক্রম করিতে বাধ্য করা হইতেছে··· চাবুকের চোটে সকলের পিঠের চামড়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল···চতুর্দিকে হত্যা আর হাহাকার··· যতীন আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

যতীন। আর তো দেখা যায় না···এ ছাড়া আর কিছু নেই?

ইতিহাস। না, এরাও আছে—

এক জ্যোতির্ময় পটভূমিকায় আসিয়া দাঁড়াইলেন—বাল্মীকি, ব্যাস, কপিল, কণাদ, গৌতম, পাতঞ্জল, জৈমিনি, চরক, নাগার্জুন অশ্বঘোষ, বসুমিত্র, হরিসেন, কালিদাস, ভবভূতি, ভাস, শঙ্করাচার্য রামানুজ,

বাণভট্ট, সুবন্ধু, ভারবী, শ্রীহর্ষ, মাঘ, কহ্লন, বিহ্লন, নন্দী, আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য, খনা, লীলাবতী, রঘুনন্দন, মাধবাচার্য, রামানন্দ, কবীর, নানক, গুরুগোবিন্দ সিং, চৈতন্য, ফৈজি, আবুল ফজল, টোডরমল, তানসেন, বীরবল···তাহার পর কিছুক্ষণ অন্ধকার···পটভূমিকা আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল···দেখা গেল রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ···তাহার পর ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল মহাত্মা গান্ধীর ছবি···অসহযোগ অন্দোলন···চম্পারণ সত্যাগ্রহ··· দাণ্ডি অভিযান···শীর্ণকান্তি খর্ব ব্যক্তিটি লাঠির উপর ভর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছেন···নগ্নগাত্র পরিধানে শুভ্র খদ্দরের কটিবাস···পশ্চাতে বিরাট জনতা আব্রাহ্মণ চণ্ডাল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সব চলিয়াছে··· জনতার ভিতর হইতে গুঞ্জন উঠিতেছে···জনতার দৃশ্য মিলাইয়া গেল। ইতিহাসও অদৃশ্য হইলেন। কিন্তু গুঞ্জনটা থামিল না। ঘাড় ফিরাইয়া যতীন দেখিল, ভ্রমরটা ঘরের ভিতরে গুনগুন করিয়া বেড়াইতেছে। কখন ঢুকিয়াছে, সে টের পায় নাই।

যতীন। তুমি আবার এলে যে?

ভ্রমর। আমি খুঁজছি।

যতীন। কাকে?

ভ্রমর। তাকে।

যতীন। কে সে?

ভ্রমর। তা তো জানি না।

যতীন। যাকে জান না, তাকে খুঁজছ!

ভ্রমর। জানি, কিন্তু তোমাকে বোঝাতে পারব না।

বাহিরে পাখির সুর শোনা গেল—ফটিক জল, ফটি—ক জল। আর একটা দৃশ্য চকিতে ফুটিয়া মিলাইয়া গেল। নোয়াখালির জঙ্গলে

মহাত্মাজী অন্ধকারে কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন—সঙ্কীর্ণ সাঁকো পার হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

যতীন। আমি কিন্তু যা জানি, তা তোমাকে বোঝাতে পারি।

ভ্রমর। তার মানেই, ঠিক জান না।

যতীন। জানি না? বল কি?

ভ্রমর। অন্তরের গভীর অনুভূতি কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়?

সহসা এক অদ্ভুত রূপান্তর ঘটিল। ভ্রমর দেখিতে দেখিতে উপনিষদের ঋষি-মূর্তি পরিগ্রহ করিল। তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ বর্ণ, পিঙ্গল কেশ, নীল নয়ন, ঋজু সমুন্নত দেহ, জ্যোতির্ময়।

উপনিষদের ঋষি। যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ—যে ভাবে, আমি জানিয়াছি, সে জানে নাই; যে মনে করে, আমি জানি না, সে-ই জানিয়াছে।

ঋষি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইলেন। ভ্রমর আবার ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

যতীন। অজানাকে খুঁজবে তা হ'লে কোন্ পথে?

ভ্রমর। অজানা পথে।

যতীন। কিন্তু তুমি তো ঘুরে বেড়াচ্ছ আমার ঘরের মধ্যে, এর সমস্তই তো জানা তোমার!

ভ্রমর। জানার মধ্যেই অজানা থাকে। আপাত-তৃপ্তির মধ্যেই লুকিয়ে থাকে যে-পিপাসা, সেই অজানা পথের সন্ধান দেয়।

বাহিরে শোনা গেল—ফটিক জল—ফটিক জল…

ভ্রমর। আমি চললাম। তোমাকে বলা রইল, একটু খোঁজ রেখো।

যতীন। কিসের খোঁজ রাখব, তাই তো বুঝতে পারলাম না!

ভ্রমর। খোঁজ পেলেই বুঝতে পারবে। চললাম।

ভ্রমর চলিয়া গেল। অশরীরী মেজদি প্রবেশ করিলেন।

মেজদি। ও মিছে কথা বলে নি। আমারও মনে হচ্ছে, এই যে আমার মাথার দপদপানি, হাতের কনকনানি, বুকের ভেতর হু-হু করছে, এর আসল কারণ, তাকে খুঁজে পাই নি। দেখি—

অসহায়ভাবে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। সশরীরে রুমি প্রবেশ করিল। মুখ অতিশয় গম্ভীর, মনে হইতেছে, যেন চোখে মুখে ঝঞ্ঝা স্তব্ধ হইয়া আছে।

রুমি। আজকের পত্রিকাটা কি এখানে?

যতীন। হ্যাঁ।

রুমি। নোয়াখালির খবর পড়েছ?

যতীন। পড়েছি।

রুমি। আমি নীচে বাংলা কাগজটায় পড়লাম। কি ভয়ানক!

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনাইয়া উঠিল।

রুমি। এখানেও দাঙ্গা লেগেছে। নীচে বৈঠকখানায় প্রকাণ্ড মীটিং। বড়দা মেজদা দুজনেই ক্ষেপে গেছেন। সেজবউদির ঘন ঘন ফিট হচ্ছে—নীলু-বিলুর কোনও খবর আসে নি।..

যতীন। নীলু-বিলু নোয়াখালি থেকে ঢাকায় চ'লে এসেছে হয়তো, ওদের সকলেরই তো ঢাকা আসার কথা।

রুমি। কেন যে সেজবউদি ওদের মামার বাড়ি পাঠাতে গেল এখন!

যতীন। ছুটিতে বেড়াতে গেছে, এমন হবে কে জানত?

রুমি। তুমি ওটা কি লিখেছ?

যতীন। না, এখনই চাই নাকি?

রুমি। না, থাক্, এখন দরকার নেই। ও পরে হ'লেও চলবে। এখন [একটু ইতস্তত করিয়া] আমাকে কিছু টাকা দিতে পারবে ছোটদা। হাতে টাকা আছে তোমার?

যতীন। কেন?

রুমি। আমি নোয়াখালি যাব।

যতীন। নোয়াখালি! একা?

রুমি। হ্যাঁ, একাই। সেখানে নীলু বিলু আছে, তা ছাড়া মেয়েদের উপর যে ভীষণ অত্যাচার হয়েছে, তা শুনে এখানে স্থির হয়ে ব'সে থাকা অসম্ভব আমার পক্ষে। আমাকে যেতেই হবে।

যতীন। চল্, আমিও না হয় যাই তোর সঙ্গে।

রুমি। তা গেলে তো ভালই হ'ত, কিন্তু এখন তোমার যাওয়া হবে না। বড়দা মেজদা ঠিক করেছেন এখনই বেরিয়ে যাবেন, সেজদা ঠাকুরঘরে গিয়ে খিল দিয়েছেন। কেউ বাড়িতে থাকবে না, বড়দা ঠিক করেছেন, তোমাকেই বাড়ি আগলাতে হবে। পাড়ায় কোথায় কোন্ ভলান্টিয়ার থাকবে, তাই ঠিক হচ্ছে। এই ফাঁকে আমি চুপিচুপি চ'লে যেতে চাই স্টেশনের দিকে খিড়কি দিয়ে। ট্রেন ছাড়বার আগে ওঁরা যেন ঘুণাক্ষরে জানতে না পারেন, দেখো—তা হ'লে কিছুতেই যেতে দেবেন না আমাকে। আমি কিন্তু যাবই—টাকা আছে তোমার কাছে তো? আমার স্কলারশিপের টাকাগুলো তো তোমাকে রাখতে দিয়েছিলাম, কোথা রেখেছ সেগুলো?

যতীন। টাকা আছে। কিন্তু তোকে ওই বিপদের মধ্যে যেতে দিতে আমারও ইচ্ছে করছে না রুমি।

রুমি। [দৃঢ়স্বরে] আমি কিন্তু যাব।

যতীন। [হাসিয়া] টাকা যদি না দিই?

রুমি। হেঁটে যাব। কি ক'রে বলছ তুমি এ কথা ছোটদা! মেয়েদের এতবড় অপমান সহ্য করব ঘরে ব'সে ব'সে?

যতীন। গিয়েই বা কি করবি তুই?

রুমি। সমস্ত প্রাণ তুচ্ছ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ব তাদের মাঝখানে, সমস্ত বুক দিয়ে আগলাব, সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করব।

যতীন। কিন্তু—

রুমি। দাও, টাকা দাও। না দিলে এই দেওয়ালে মাথা ঠুকে মরব আমি। উঃ, কি অসহায় ক'রে রেখেছ তোমরা আমাদের!

যতীন। পুরুষের কর্তব্য নারীদের রক্ষা করা, তাই বলছি।

রুমি। তোমরা নিজেদেরই রক্ষা করতে পার না, আমাদের রক্ষা করবে কি ক'রে? রক্ষা করবার অজুহাতে পঙ্গু ক'রে রেখেছ শুধু। দাও, [প্রায় চীৎকার করিয়া] দাও না—

যতীন। দিচ্ছি, দিচ্ছি। দাদারা বেরিয়ে গেলে তবে তো যাবি, ব্যস্ত কি?

রুমি। ট্রেনের বেশি দেরি নেই। আমি খিড়কি-দরজা দিয়ে এখনই বেরিয়ে যেতে চাই।

যতীন। তোর ভয় করছে না?

রুমি। ভারতবর্ষের মেয়েরা আবার ভয় করেছে কবে! গার্গী মৈত্রেয়ী থেকে শুরু ক'রে অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানী, কস্তুরবা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, কমলা নেহেরু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, বীণা দাস, প্রীতি ওয়াদ্দার, সুচেতা কৃপালনীর যা ইতিহাস, তা কি ভয়ের ইতিহাস?

রুমির চোখ মুখ হইতে এক অপরূপ আলো বিকীর্ণ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার সমস্ত দেহটাই জ্যোতিতে রূপান্তরিত হইয়া

গেল। সেই জ্যোতি ভেদ করিয়া আবির্ভূত হইলেন রাণী দুর্গাবতী ও চাঁদ সুলতানা—

রাণী দুর্গাবতী। তোমরা এর মধ্যেই কি ক'রে ভুলে গেলে যে, এই সেদিনই সম্রাট আকবরের বিপুল বাহিনীকে তুচ্ছ ক'রে সামান্য রাজপুতানী আমি সম্মুখ-সমরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, প্রাণ দিয়েছিলাম, কিন্তু মান দিই নি?

চাঁদ সুলতানা। মান দেওয়ার কথা ভাবতেই পারে না ভারতবর্ষের নারীরা। তারা জানে, নারীদের অপমান করে যে শয়তানরা, আসলে তারা দুর্বল ভীরু। তাদের হুমকিতে ভয় পায় নি কখনও আত্মসম্মানবতী ভারতরমণী। তাই শয়তান মোরাদের বিরুদ্ধে ভগ্ন দুর্গ-প্রাকারে দাঁড়িয়ে অসিহস্তে যুদ্ধ করতে করতে হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছিলাম নির্ভয়ে। কারণ মুসলমানী হ'লেও আমি ভারতরমণী। প্রাণ দিয়েছিলাম; কিন্তু মরি নি, আজও আমরা বেঁচে আছি এদের মধ্যে—

হস্ত প্রসারিত করিলেন। জ্যোতির্ময় দৃশ্য মুছিয়া গেল। যতীন দেখিল, রুমি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে—প্রদীপ্তনয়না, স্ফুরিতাধরা, বিদ্র

রুমি। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না ছোটদা, দেবে তো দাও।

যতীন। এই যে দিচ্ছি। আজ ডাক আসে নি?

রুমি। আমার একখানা চিঠি এসেছিল শুধু।

যতীন। কার চিঠি?

রুমি। উষা লিখেছে।

যতীন। সমরের বোন উষা?

রুমি। হ্যাঁ।

যতীন। সমরের খবর কি ?

রুমি। সমর নোয়াখালিতে গুণ্ডার হাতে মারা গেছে।

যতীন। সে কি !

যতীন নির্নিমেষে রুমির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রুমির মুখের একটি পেশীও বিচলিত হইতেছে না…চোখের দৃষ্টি কঠোর প্রদীপ্ত। শাণিত অসির মত।

রুমি। কতক্ষণ আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখবে ছোটদা ?

যতীন। এই যে দিচ্ছি।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া টাকা বাহির করিয়া দিল। রুমি চলিয়া গেল। যাইবার সঙ্গে সঙ্গে যতীন কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, সকলে, এমন কি রুমিও, কর্তব্যে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে, সে-ই কেবল অলসের মত বসিয়া স্বপ্নের জাল বুনিতেছে। পাড়ার শৈলেনবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। শৈলেন তথাকথিত কমিউনিস্ট।

শৈলেন। তুমি কি করছ হে যতীন, তেতলার ঘরে ব'সে ? যুদ্ধে যাবে না ? তোমার দাদারা তো সম্মুখ-সমরের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।

যতীন। সম্মুখ-সমরের জন্যে ! তাই নাকি ?

শৈলেন। হ্যাঁ, ওদের বস্তিটা আক্রমণ করবার আয়োজন হচ্ছে।

যতীন। আপনিও যাবেন ?

শৈলেন। আমি ? [হাসিলেন] না, আমি যাব না। [গম্ভীর হইয়া গেলেন। পুনরায় হাসিয়া] যেতাম, যদি তোমার বড়দার মতের সঙ্গে সায় দিতে পারতাম। কিন্তু পারলাম না। আমি মনে করি, মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবিটা সঙ্গত দাবি। সেটা মেনে নিলে

আর ঝগড়া থাকে না। হাজার মারপিট ক'রেও কোন ফল হবে না, যতক্ষণ না আসল সমস্যাটার সমাধান হচ্ছে। তোমার কি মত?

যতীন। আমার তো মনে হয়, আপাতত আমাদের আসল সমস্যা পরাধীনতা। আমাদের সকলেরই আগে চেষ্টা করা উচিত তার থেকে মুক্তি পাবার। স্বাধীনতা-অর্জনের চেষ্টায় যারা বাধা দেবে, তারাই আমাদের শত্রু—তা সে হিন্দু মুসলমান যেই হোক।

শৈলেন। পাকিস্তান যারা চায়, তারাও ঠিক ওই কথা বলছে। কিন্তু স্বাধীনতা পাবার আগে তারা জানতে চায়, ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতে তাদের অবস্থাটা কি হবে অর্থাৎ তাদের ধর্ম সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ থাকবে কি না! যে দেশে শতকরা পঁচাত্তর জন হিন্দু, সেখানে তাদের এ দাবিটা কি অগ্রাহ্য করবার মত?

যতীন। দাবিটা গ্রাহ্য করবার মত হ'লে কেউ তা অগ্রাহ্য করত না, করতে পারত না। ইতিহাসের দিক দিয়ে পাকিস্তানের কোন ভিত্তি নেই। ভৌগোলিক ঐক্য যে নেই, তা আশা করি আপনিও মানবেন। পূর্ব-পাকিস্তান আর পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে সহস্র মাইলের ব্যবধান, দক্ষিণ-ভারতের হিন্দুপ্রধান হায়দ্রাবাদ ওসমানিস্তান হবে নাকি শুনছি! সংস্কৃতির দিক থেকেই বা ঐক্য কোথায়? পেশোয়ারী মুসলমান আর নোয়াখালির মুসলমানের সংস্কৃতি কি এক? ষষ্ঠ শতাব্দীর ইসলাম-সংস্কৃতি কি কোন দেশে আছে এখন আর? বর্তমান ইসলাম-জগৎ অনেক দিন তার থেকে বহুদূরে স'রে গেছে, প্রত্যেক ইসলাম-দেশের এখন আলাদা চেহারা, আলাদা আদর্শ। মিশরে অর্ধরাজতন্ত্র, প্যালেস্টাইনে গোলযোগতন্ত্র, সিরিয়াতে প্রজাতন্ত্র, আরবে ইবন সাউদের ইচ্ছাতন্ত্র, ট্রান্সজর্ডনে আমিরতন্ত্র। ইরাকের শিশুরাজাকে কেন্দ্র ক'রে যে রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠছে, তা কি ইসলাম-রাষ্ট্র? আফগানিস্তান কার ইঙ্গিতে চলেছে? সুতরাং পাকিস্তানের দাবির যুক্তি কোথায়? রাষ্ট্রগঠনের পটভূমিকায় যে সব জিনিস থাকা দরকার—ভৌগোলিক ঐক্য, সংস্কৃতির ঐক্য, আদর্শ-নিষ্ঠা, আদর্শের সার্বভৌমিকতা

—পাকিস্তানের তা আছে কি? যাঁরা আজ পাকিস্তানের পরিকল্পনা করছেন, তাঁরাই কি আচারে ব্যবহারে কর্মে চিন্তায় ইসলাম-আদর্শকে অনুসরণ করেন? তা ছাড়া আরও একটা কথা। রাশিয়াতে মুসলমান আছে, চীনে মুসলমান আছে, কই, সে সব দেশে তো পাকিস্তান হয় নি, আর হয় নি ব'লে যে সে দেশে মুসলমান-সংস্কৃতি লোপ পেয়েছে তাও নয়।

শৈলেন। সবচেয়ে বড় যুক্তি—ওরা ভয় পাচ্ছে যে, স্বাধীন ভারতে হিন্দুর প্রাধান্য হ'লে ওদের অবলুপ্ত হয়ে যেতে হবে।

যতীন। [হাসিয়া] ভয়টা ওদের নয়, ভয়টা আসলে ইংরেজদের। মুখোশটা তো খুলেই গেছে এখন। ওদের মাইনরিটির জন্যে চমৎকার চিন্তা আসলে যে ওদের অন্নচিন্তাচমৎকারা, তা আর বুঝতে কারও বাকি নেই। মজ্জমান ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম পাকিস্তান-খড় আঁকড়ে বাঁচতে চাইছে।

শৈলেন। সেটা তোমরা বলছ বটে, কিন্তু হিন্দু মেজরিটির হাতে ওরা যে নিরাপদ নয়, সে কথা মানতেই হবে।

যতীন। ইতিহাসের নজির কিন্তু অন্য রকম। মোগল সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনেও কোনও মুসলমান কি সংস্কৃতিলোপের ভয়ে হিন্দুরাজ্য ত্যাগ করেছে? মানসিংহ রাজমহলে মুসলমানদের জন্য মসজিদ করিয়েছিলেন, রাজা জয়সিংহ করেছিলেন জয়পুরে। মালবের হিন্দু রাজারা মুসলমান প্রজাদের জন্য মক্তব করিয়েছিলেন, মুসলমান মৌলভীদের বৃত্তি দিতে দ্বিধা করেন নি। ঔরংজেবের অত্যাচারেই বরং শিয়া মুসলমানেরা দাক্ষিণাত্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। হিন্দুরাজ্যে যৌথভাবে মুসলমাননারী-নির্যাতনের কটা দৃষ্টান্ত দিতে পারেন আপনি? ঔরংজেব-মহিষী শিবাজীর হাতে বন্দিনী হয়েও সসম্মানে স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পেরেছিলেন। খোঁজ ক'রে দেখুন, প্রত্যেক হিন্দু রাজার অধীনে সব সময়েই মুসলমানেরা স্বেচ্ছায় সৈন্য-বিভাগে চাকরি করত। মারহাট্টারাই বিজাপুর-গোলকুণ্ডা-পতনের পর আশ্রয় দিয়েছিল

মুসলমানদের। বার-ভুইঞার মধ্যে মাত্র তিনজন মুসলমান ছিলেন। চান্দ রায়ের ভগ্নী সোনামনিকে হরণ ক'রেই তো ইসা খাঁ মুসা খাঁর রাজ্য ধ্বংস হ'ল। মুসলমান রাজত্বের অবসানে মুসলিম অত্যাচারের ভয়ে মধ্যভারত থেকে মুসলমানরা দলে দলে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে—হিন্দুরাজ্যে। বিচার ক'রে দেখলেও এটা বোঝা শক্ত নয় যে, হিন্দুধর্মই একমাত্র ধর্ম, যা শুধু ইসলামকে কেন, যে কোন ধর্মকেই প্রসন্নচিত্তে আশ্রয় দিতে পারে। কারণ সনাতন হিন্দুধর্মের কোনও' গণ্ডি নেই, কোনও বেড়া নেই, অসীম উদারতাই এর বিশেষত্ব। মুসলমানদের ভয়টা অমূলক, অখণ্ড ভারতে ওরা আনন্দেই থাকবে।

শৈলেন। [হাসিয়া] দেখ ভায়া, যা আওড়ালে তা, কেতাবের মুখস্থ বুলি। হিন্দুধর্মের উদারতার নজির দেখতে পাবে পাড়াগাঁয়ের পুকুরঘাটে গেলে। হিন্দুর ঘাটে মুসলমান জল নিতে পায় না, হিন্দুর গ্রামে মুসলমানের কোরবানি' করবার উপায় নেই। হিন্দুধর্মের উদারতার ঠেলায় আর একটা নতুন জাতই তৈরি হয়ে উঠছে—শিডিউল্‌ড কাস্ট্‌।

যতীন। সেটা হিন্দুধর্মের দোষ নয়, অশিক্ষার দোষ। বহুদিন পরাধীন থেকে আত্মবিস্মৃত হয়েছি। শিডিউল্‌ড কাস্ট্‌—এখনকার বুলি। ভারতের সনাতান ধর্ম যে অস্পৃশ্যকে ঘৃণা করে নি, তার প্রমাণ—কবীর, নানক, দাদূ, রজ্জব, কত নাম করব? না, স্বাধীন ভারতে ভারতধর্মই প্রতিষ্ঠিত হবে, অস্পৃশ্যতা ব'লে কিছু থাকবে না। এখন থেকেই তা দূর করবার চেষ্টা চলেছে। সফলও হবে সে চেষ্টা। ওর জন্যে ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করার দরকার নেই। অখণ্ড ভারতই আমাদের কাম্য।

শৈলেন। আচ্ছা, হঠাৎ আজ তোমরা অখণ্ড ভারতের ধুয়ো তুলেছ কেন, বুঝি না। অখণ্ড ভারত কি ছিল কোনকালে? রামায়ণ-মহাভারতের আমল থেকেই দেখ না, পঞ্চাশটা দেশের পঞ্চাশটা রাজা

পরস্পরের মধ্যে মারামারি করছে। আরও এগিয়ে এস, থানীশ্বরের সঙ্গে মৌখরী, গৌড়ের সঙ্গে থানীশ্বর, পৌণ্ড্রের সঙ্গে বঙ্গ, বঙ্গের সঙ্গে সমতট—কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ। আর সকলের মূলে ওই সেল্‌ফ-ডিটার্‌মিনেশন—প্রত্যেকেই নিজের সংস্কৃতি বাঁচাতে চায় এবং প্রচার করতে চায়। কারও দেবতা বিষ্ণু, কারও শিব, কেউ বৌদ্ধ, কেউ শাক্ত। এ ছাড়া আর কি আছে? ক্রমাগত দেখে যাও, এই পাবে। এই যাদের ইতিহাস—মানে, দেশের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—হঠাৎ তাদের আজ অখণ্ড ভারত ব'লে চীৎকার করবার মানে?

যতীন। কারণ ওইটেই আদর্শ। ইতিহাসেই দেখা গেছে, যখনই ভারত অখণ্ড হয়েছে কিংবা অখণ্ডতার কাছাকাছি এসেছে, তখনই তার সমৃদ্ধি। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, হর্ষবর্ধন, ধর্মপাল, আকবর প্রভৃতি তার উদাহরণ, এমন কি ইংরেজ-রাজত্বের নিষ্ঠুর শোষণ সত্ত্বেও আমাদের যা কিছু উন্নতি তা ভারতের অখণ্ডতার জন্যে—ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্রতন্ত্রে তাই আমরা অখণ্ডতা চাই।

শৈলেন। কিন্তু এই ছত্রিশ জাতের মধ্যে অখণ্ডতা রাখতে হ'লে যে নিরপেক্ষতার প্রয়োজন, তা কি ওই হিন্দু-মেজরিটি স্বাধীন রাষ্ট্রতন্ত্রে থাকবে? বিদেশী ইংরেজের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা অসম্ভব ছিল তবু কতকটা। সুতরাং মুসলমানদের ভয়টা অমূলক নয়।

মেজদা প্রবেশ করিলেন এবং শৈলেনবাবুর কথার খানিকটা শুনিতে পাইলেন।

মেজদা। মুসলমানদের ভয়? কে মুসলমানদের ভয় করছে?

ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া এমনভাবে চাহিলেন, যেন মুসলমান-ভীত কোনও লোকের সান্নিধ্য তিনি সহ্য করিতে প্রস্তুত নন।

শৈলেন। [হাসিয়া] না, মুসলমানকে ভয় করছে না কেউ। আমি যতীনকে শুধু বোঝাচ্ছিলাম যে, মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবিটা অসঙ্গত নয় নিতান্ত।

মেজদা। [অপ্রত্যাশিত রুক্ষকণ্ঠে] দেখ শৈলেন, তোমার ওই কমিউনিস্টিক বুজরুকি নিয়ে স'রে পড় মানে মানে বলছি। তা না হ'লে অপমানিত হবে।

শৈলেন। [সবিস্ময়ে] হঠাৎ আমার উপর রাগের কারণ! [হাসিয়া] যাঃ বাবা!

মেজদা। কারণ তোমাদেরও আমি মুসলমান ব'লে মনে করি। মেটিয়াবুরুজে তোমরা যা করেছ, তা কাগজে প'ড়ে অবধি আপাদমস্তক জ্বলছে। তুমি পাড়ার ছেলে, অনেকদিনের আলাপ, [তিক্ত হাসি হাসিয়া] হিন্দু কিনা, তাই এ দুর্বলতাটুকু কাটিয়ে উঠতে পারি নি এখনও, কিন্তু ব্যারোমিটার যে রকম নাবছে তরতর ক'রে, কি হয় বলা যায় না। স'রে পড়।

শৈলেন। মেটিয়াবুরুজে কোথায় কে কি করেছে তার জন্যে আমার উপর ঝাল ঝাড়বে! আশ্চর্য বিচারবুদ্ধি তোমার!

মেজদা। সেদিন গোখরো সাপটা মারবার বেলায় তোমার বিচারবুদ্ধিও এই রকম ছিল। সে তো তোমায় কামড়ায় নি কিংবা কাউকে কামড়াতেও যায় নি, খড়ের গাদায় লুকিয়ে ছিল। মারলে কেন তাকে?

শৈলেন। উপমাগুলো একটু ভদ্রলোকের মত দিলেই ভাল হয়। মানুষের সঙ্গে সাপের তুলনা যে চলে না, সে বুদ্ধিটুকু তোমার কাছে প্রত্যাশা করি অন্তত মেজদা।

অনুকম্পাভরে একটি সবজান্তাগোছ হাসি হাসিল।

মেজদা। [সহসা সপ্তমে চড়িয়া] বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

ঠাস করিয়া তাহার গালে একটা চড় মারিলেন। শৈলেনবাবু পড়িয়া যাইতেছিলেন, যতীন ধরিয়া ফেলিল এবং চেয়ারটায় বসাইয়া দিল।

যতীন। ছি ছি, মেজদা, কি করলে তুমি?

মেজদা। বেশ করেছি। ঘাড়ধাক্কা দিয়ে দূর ক'রে দে। সাপের জাত। তোকে যা বলতে এসেছিলাম, শোন্। বড়দা আর আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, এখানেও গোলমাল শুরু হয়েছে, তোমার সেজদা পূজোর ঘরে, কখন বেরুবেন ঠিক নেই। তোমার উপরই বাড়ির ভার রইল, কোথাও বেরিও না যেন।

যতীন। আচ্ছা।

মেজদা চলিয়া গেলেন। কিন্তু অশরীরী বেশে তখনই আবার ফিরিয়া আসিলেন। যতীন শৈলেনবাবুর দিকে চাহিল, দেখিল, তিনি আশ্চর্যরকম সামলাইয়া লইয়াছেন। এমনভাবে জানালার দিকে চাহিয়া বহির্দৃশ্য দেখিতেছেন, যেন কিছুই হয় নাই। অশরীরী মেজদার অস্তিত্ব তিনি অনুভবই করিতে পারিলেন না। যতীনের মনের ভাবও অশরীরী বেশে মূর্ত হইল এবং অশরীরী মেজদার সহিত আলাপ করিতে লাগিল। শৈলেনবাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

অশরীরী মেজদা। দেখ যতীন, আমার ওই শৈলেনের কাছে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু পারছি না।

যতীনের মনের ভাব। খামাখা কেন তুমি ওঁকে অপমান করতে গেলে মিছিমিছি!

অশরীরী মেজদা। কারণ ওকে ঘৃণা করি। [একটু থামিয়া] শুধু ওকে নয়, সকলকে—হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বাঙালী বিহারী সাহেব মাড়োয়ারী আত্মীয় অনাত্মীয়—সকলকে। নিদারুণ ঘৃণার উত্তপ্ত

ঘূর্ণাবর্তে সারাজীবনটা নাকানি-চোবানি খাচ্ছি, সর্বাঙ্গ জ্ব'লে পুড়ে খাক হয়ে গেল, কিন্তু কি করব— নিজের যুক্তিকে অতিক্রম করতে পারি না।

যতীনের মনের ভাব। যুক্তি মানে?

অশরীরী মেজদা। যুক্তি দিয়ে বিচার ক'রে দেখেছি, কোথাও এতটুকু ভাল দেখতে পাই নি। ধার্মিকের মধ্যে ভণ্ডকে, স্বদেশসেবীর মধ্যে স্বার্থপরকে, সাহিত্যিকের মধ্যে যশাকাজ্ক্ষীকে, বীরের মধ্যে গোঁয়ারকে দেখেছি, মাতৃস্নেহেও প্রত্যক্ষ করেছি পাশবিক ক্ষুধা, পত্নীপ্রেমে যৌন-লালসা, নিপুণ অতিথি-পরায়ণতার মধ্যে দেখেছি বাহাদুরি প্রকাশের চেষ্টা, উপকারীর মধ্যে দেখেছি মতলববাজকে— কোথাও একবিন্দু আলো দেখতে পাই নি—কোথাও না। এখন যা করতে যাচ্ছি তা ভাল ব'লে নয়, বড়দাকে ভয় করি ব'লে।

যতীন। কিন্তু আলো তো অনেক আছে মেজদা, তুমি দেখতে পাচ্ছ না কেন?

বিস্ফোরণের মত একটা শব্দ হইতেই যতীন ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, একটি রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র বামনমূর্তি দাঁড়াইয়া আছে—তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া স্পর্ধার লাল আভা বিকীর্ণ হইতেছে। বিস্ফোরণের শব্দটা বোধ হয় বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র হইতে নির্গত হইল। চোখের দৃষ্টিতে ঔদ্ধত্য মূর্ত।

বামন। আমি দেখতে দি নি।

যতীন। কে আপনি?

বামন। আমি ওর অহঙ্কার।

যতীন। মেজদার অহঙ্কার—বামন!

বামন। বাপের সম্পত্তি ছাড়া আর কি আছে ওর? সারাজীবন উদ্বাহু হয়ে আছে চাঁদ ধরবে ব'লে, কিন্তু নাগাল পায় নি, চাঁদের

কলঙ্কটাকে নিয়েই মাতামাতি করছে তাই। তোমাদের মধ্যেও আমি আছি, কিন্তু ভিন্ন রূপে। [হাসিয়া] চিনতে পারছ না তোমার নীল পরীকে? তোমার চোখে আমিই পরিয়েছি স্বপ্নের অঞ্জন, আমিই সুবর্ণখচিত পুষ্পকরথে চড়িয়ে তোমার বড়দাকে নিয়ে গেছি আভিজাত্যের অলকাপুরীতে, তোমার সেজদাকে বেঁধেছি স্বেচ্ছাবৃত কৃচ্ছ্র সাধনে। [আবার চোখে মুখে স্পর্ধা মূর্ত হইল] আমিই অসম্ভবকে সম্ভব করি, স্বয়ং বিধাতার সৃষ্টি-প্রেরণার মূলেও আমি বর্তমান।

সহসা অদৃশ্য হইয়া গেল। যতীনের চোখে চকিতের মধ্যে আর একটা দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। অন্ধকার গভীর অরণ্য··· একটা জটিল শাখাপত্র-বহুল গাছে একটা ঘড়ি টাঙানো আছে···তাহাতে দুইটা বাজিয়াছে··· পাঁচটা বাজা উচিত···অরণ্য ভেদ করিয়া অতিকষ্টে মহাত্মাজী অগ্রসর হইতেছেন, ঘড়িটাকে ঠিক না করা পর্যন্ত তিনি থামিবেন না।···এ দৃশ্যও ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।···যতীন দেখিল, অশরীরী মেজদা তখনও দাঁড়াইয়া আছেন।

অশরীরী মেজদা। না, কোথাও আলো দেখতে পাই না। সূর্যের স্পট্‌গুলোর কথাই আগে মনে পড়ে, মেঘের মধ্যে ধূলিকণার অস্তিত্ব কল্পনা করি। বুঝতে পারি যে, আমার মধ্যেও গলদ আছে, কিন্তু স্বীকার করতে পারি না। শৈলেনের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত, কিন্তু পারছি না। চললাম।

অশরীরী মেজদা চলিয়া গেলেন। যতীন দেখিল, শৈলেনবাবু ঠিক তেমনিভাবে জানালার দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন।

যতীন। [অতিশয় সঙ্কোচভরে] কিছু মনে করবেন না শৈলেন-দা। মেজদা একটু—

শৈলেন। [এক মুখ হাসিয়া] আরে, ওতে মনে করবার কি আছে! তোমার মেজদাকে চিনি না? ছেলেবেলা থেকে দেখছি, চিরকালের গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক। রাস্তায় একটা ষাঁড়ে যদি গুঁতিয়ে দিত, কি আর করতাম!

বড়দা প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে দুইটি বন্দুক।

বড়দা। যতীন, দুটো বন্দুক রেখে যাচ্ছি তোমার কাছে। বাড়ি থেকে এক পা নড়বে না। আমরা দুটো বন্দুক নিয়ে যাচ্ছি, তোমার কাছে দুটো থাক্। একটা তোমার জন্যে, আর একটা তোমার সেজদার জন্যে। তোমার সেজদা পূজোর ঘরে, তাই তার হাতে দিয়ে যেতে পারলাম না, তোমার কাছেই থাক্, যদি চায় দিও। ইদানীং পূজো নিয়ে মেতেছে, কিন্তু ও-ই আগে সবচেয়ে ভাল বন্দুক চালাত। আচ্ছা, যাই তা হ'লে। খুব সাবধানে থেকো।

বড়দা শৈলেনবাবুর উপস্থিতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। শৈলেনবাবু কিন্তু এ তাচ্ছিল্য সহ্য করিতে পারিলেন না, গায়ে পড়িয়া আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

শৈলেন। আপনারা চললেন তা হ'লে?

বড়দা। [অভিজাতসুলভ নম্রতাসহকারে] যেতেই হবে, না গিয়ে উপায় নেই। তুমি কি এখানেই থাকবে? মেয়েদেরও নিয়ে এস না হয় এখানে। তোমাদের অঞ্চলটায় ওরা আছে দু-এক ঘর—

শৈলেন। না, আমি বাড়ি যাব। [হাসিয়া] আমার সে সব ভয় নেই।

বড়দা। ও, তা হ'লে সেই ভাল। চা খেয়ে যাও তা হ'লে, চা কি এখানে পাঠিয়ে দিতে বলব?

শৈলেন। সে হবে এখন। কিন্তু একটা কথা—

বড়দা চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু কথাটা শুনিবার জন্য ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

শৈলেন। আমার খুবই আশ্চর্য লাগছে যে, আপনার মত লোকও এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্ব করতে যাচ্ছেন। কেন যাচ্ছেন ভেবে দেখেছেন কি একবারও ?

বড়দা। আমার ব্যক্তিগত ভাবনার স্থান এতে নেই। ডাক এসেছে, যেতেই হবে। [হাসিলেন]

শৈলেন। আপনাদের এই উৎসাহ যদি দেশের প্রোলিটারিয়েটদের উন্নতি-সাধনে লাগাতে পারতেন, তা হ'লে একটা কাজের মত কাজ হ'ত। অ্যারিস্টক্র্যাটদের চাপে ম'রে গেল যে বেচারারা !

বড়দার চোখের কোণে একটা আলোর দীপ্তি ক্ষণিকের জন্য জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই হাসির আভায় তাহার জ্বালা নিবিয়া গেল। শৈলেনের সঙ্গে তর্ক করিয়া তিনি নিজেকে অবনত করিতে চাহিলেন না, একটু মুচকি হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

যতীন। একটু চা খেয়ে যান।

শৈলেন। তা যেতে পারি, কাল থেকে চা খাই নি। আমাদের বাড়িতে চা ফুরিয়েছে কাল থেকে। [হাসিয়া] দোকান-পাট বন্ধ, কিনতেই পারি নি। একটু তাড়াতাড়ি পেলে ভাল হ'ত, বাড়ি থেকে অনেকক্ষণ বেরিয়েছি, মেয়েরা ভাবছে হয়তো।

যতীন। হ্যাঁ, এই যে— ছট্টু ছট্টু—এই বেহারী— ওরে, কে আছিস ? সব পালিয়েছে বোধ হয়। ওরে ছট্টু—

সহসা দ্বারপ্রান্তে অশরীরী বড়দা প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে রূপার ট্রে, ট্রের উপর অতিশয় মূল্যবান টী-সেট। ট্রেটি সামনের

তেপায়ার উপর রাখিয়া নিজহস্তে তিনি চা ছাঁকিতে লাগিলেন। উৎকৃষ্ট দার্জিলিং চায়ের গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হইয়া উঠিল। এক কাপ চা ছাঁকিয়া তিনি শৈলেনের দিকে আগাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, শৈলেনবাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। যতীনের অশরীরী-মনোভাবের সহিত বড়দার নীরব আলাপ শুরু হইল।

যতীনের মনোভাব। বড়দা, তুমি কেন চা আনতে গেলে?

অশরীরী বড়দা। কেন, তাতে ক্ষতি কি? অতিথিকে সেবা করলে আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয় না। তা ছাড়া আর একটা কারণে এলাম, শৈলেন প্রোলিটারিয়েটদের কথা তুলেছিল। ওর মুখের ওপর জবাবটা দিলে অশোভন হ'ত তাই দিই নি; তোকে ব'লে যাচ্ছি, তুই যদি পারিস আভাসে ইঙ্গিতে ব'লে দিস, [হাসিয়া] অভদ্রতা ক'রো না যেন। আভিজাত্যের সঙ্গে অভদ্রতা মানায় না। আচারে, ব্যবহারে, চিন্তায়, কর্মে যা নিখুঁত, তাই আভিজাত্যের ভিত্তি। আভিজাত্য আদর্শবাদী, কোন কারণেই তার সুর নেবে যায় না। এরা ইংলণ্ডের চার্লস্, ফ্রান্সের লুই, রুশিয়ার নিকোলাস আর পরাধীন ভারতবর্ষের জনকতক হঠাৎ-বড়লোক ডাকাত রাজা-জমিদারদের দশ-হাত-ফেরতা ইতিহাস মুখস্থ ক'রে আসল আভিজাত্যের স্বরূপ ভুলে গেছে। রাজর্ষি জনক বা রাজা হরিশ্চন্দ্রের নাম এদের ক্বচিৎ মনে পড়ে, আর যখন পড়ে তখন এদের কাণ্ড দেখে দুঃখ হয়। আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের বিষয়ে রচিত জনপ্রিয় নাটকে আজকাল রামের চরিত্র যে ভাবে আঁকা হয় এবং তা দেখে লোকে যে রকম হাততালি দেয়, তাতে জনতার রুচিবোধের প্রশংসা করতে পারি না। সীতাকে বনে পাঠিয়ে রামচন্দ্র কুলগুরু বশিষ্ঠের সামনে অশিষ্টের মত দাপাদাপি করছে আর সামান্য কেরানীর মত হাউহাউ ক'রে কাঁদছে, এই দেখে সবাই মহা খুশি। এর থেকে মনে হয়, আভিজাত্যের স্বরূপ এরা ভুলে গেছে। অর্থলোলুপ ইহলোকসর্বস্ব বণিকসভ্যতার আওতায় বহুকাল বাস করার ফলে এদের

ধারণা হয়েছে যে, নিছক পশুত্বের চর্চা করাটাই পরমার্থ, আর যেন-তেন-প্রকারেণ টাকা জমাতে পারলেই বুঝি আভিজাত্য হয়। ইংরেজী 'অ্যারিস্টক্র্যাসি' শব্দটারও ব্যাকরণ যদি এরা অনুধাবন করত, তা হ'লে বুঝতে পারত যে, যে প্রাচীন আর্য গ্রীকজাতি থেকে সমস্ত ইয়োরোপীয় সভ্যতার জন্ম, সেই গ্রীক ভাষার 'অ্যারিস্টস' শব্দ থেকে অ্যারিস্টক্র্যাসি কথাটা উৎপন্ন হয়েছে ; 'অ্যারিস্টস'-এর অর্থ—যা সর্বোৎকৃষ্ট। অসভ্য কোটিপতিরা নয়, যারা সর্ববিষয়ে সর্বতোভাবে সর্বোৎকৃষ্টপন্থী তারাই 'অ্যারিস্টক্র্যাট'। বিদুর অ্যারিস্টক্র্যাট, ধৃতরাষ্ট্র নয়। কিন্তু আজকাল কেউ ব্যাকরণ পড়তে চায় না, নোট মুখস্থ ক'রে পরীক্ষা পাস করে। ব্যাকরণের মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতির যে ইতিহাস লেখা আছে, তা জানতে চায় না কেউ আজকাল—কষ্ট ক'রে কার্ল মার্কস পড়ে, পাণিনি পড়ে না। তাই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত তা জানে না কেউ, আভিজাত্যের স্বরূপও অজ্ঞাত তাই অনেকের কাছে। এরা মনে করে, পৃথিবীতে দুটি মাত্র জাত আছে—ধনী এবং দরিদ্র, এবং এই ধনী-দরিদ্রদের কোন রকমে একটা কটাহে চড়িয়ে বিদ্রোহের আগুনে গালিয়ে, বিজ্ঞানের ফ্যাক্টারিতে অর্থনৈতিক ছাঁচে ঢালাই ক'রে ফেলতে পারলে পিলপিল ক'রে বাজারে যে মানুষ বেরুবে, তাদের মধ্যে আর কোন বৈষম্য থাকবে না, ছাঁচে-ঢালাই-করা পুতুলের মত সব সমান হয়ে যাবে, জগতে সাম্য স্থাপিত হবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যে সূর্য-চন্দ্রের মত সব সমাজে চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে, তা এরা বোঝে না ; মনে করে, কোনও একটা বিশেষ ফরম্যুলায় ফেলে দিলেই সব বুঝি একাকার হয়ে যাবে। ওদের সোভিয়েট রাশিয়ার দিকেও ভাল ক'রে চেয়ে দেখে না ওরা, দেখলে দেখতে পেত, সেখানেও এই চতুর্বর্ণ বিরাজমান। সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে তাকালে আমার আনন্দ হয়, নবজাগ্রত জাতির জীবন্ত শক্তির মহিমায় ওরা ভরপুর, ওরা জেগেছে, ওরা বাড়ছে। ওরা ভাঙবে গড়বে বদলাবে, কত কি করবে! ওদের নকল ক'রে আমাদের দেশে এই যে

অদ্ভুত একটা জগা-খিচুড়ি হয়েছে, এদের দেখলে দুঃখ হয়, হাসিও পায়। আমাদের বেচু খানসামার কথা মনে পড়ে, গত যুদ্ধের সময় খবরের কাগজ দেখে সে কাইজারের মত গোঁফ রেখেছিল। এরাও শ্রমিকের দুঃখে বিগলিত হয়েছে। দুঃখীর দুঃখে বিচলিত হয়ে যাঁরা আত্মবিসর্জন করেন, তাঁরাই তো প্রকৃত আভিজাত্যমণ্ডিত মহাত্মা, মহাত্মা গান্ধীই বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজাত ব্যক্তি। কিন্তু এ রকম মহাত্মা যুগযুগান্তরে দু-একজন আবির্ভূত হন,—বুদ্ধ চৈতন্য অলিতে গলিতে ক্লাবে থিয়েটারে কিলবিল ক'রে বেড়ায় না কখনও। সর্বহারা শ্রমিকদের দুঃখে বিগলিতচিত্ত এদের দেখলে মনে হয়, এদের চিত্ত যে বিগলিত সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা শ্রমিকের দুঃখে নয়, ফ্যাশানের মোহে এবং ভোগের লোভে। সত্যিই যদি এরা শ্রমিকদের দুঃখে বিচলিত হ'ত, তা হ'লে এদের ব্যবহার মনকে ক্ষুব্ধ করত না, মুগ্ধ করত। মতের সঙ্গে না মিললেও মুগ্ধ করত। আমি এদের শ্রদ্ধা করবার চেষ্টা করেছি, পারি নি। বার বার মনে হয়েছে, তা হ'লে এরা এত বিলাসী, এত উচ্ছৃঙ্খল হ'ত না। (ইটের উপর ব'সে মাটির গ্লাসে বাজে চা খায় যারা, তাদের দুঃখে বিগলিত হয়ে এরা যখন গদি-আঁটা চেয়ারে ব'সে দামী কাপে উৎকৃষ্ট দার্জিলিং চা অনর্গল পার করে, তখন, সত্যি বলছি, সন্দেহ হয়।) অতীত গৌরব, জাতীয় সংস্কৃতি, আত্মমর্যাদা সমস্তই মূল্যহীন এদের কাছে—তাই শৈলেন অনায়াসে প্রশ্ন করলে, আপনি এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্ব করতে যাচ্ছেন কেন? না গেলেই যে অন্যায় হ'ত, সে বোঝবার বুদ্ধি ওর নেই—আত্মসম্মানের কোনও ধার ও ধারে না। বার বার কপচে প্রোলিটারিয়েট কথাটা মুখস্থ করেছে কেবল। এংগেল্‌সের কথা বেদবাক্য ব'লে মনে করে, গীতা ওর কাছে মূল্যহীন। 'হত্যাকাণ্ড' 'হত্যাকাণ্ড' ব'লে চীৎকার করছে তাই। যুদ্ধে চিরকালই নিরীহ লোক মারা যায়। আমরা যুদ্ধ করতে চাইও না. কিন্তু বাড়ি চড়াও হয়ে নিরীহ ছেলেমেয়েদের মারবে, আমরা আত্মরক্ষাও করব না? বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, চণ্ডীতে

আমরা আস্থাবান, কাউকে মারতে বা বাঁচাতে পারি এ অহঙ্কার আমাদের নেই, কর্তব্যপথে নির্ভয়ে নিরাসক্তচিত্তে অগ্রসর হওয়াটাই পৌরুষ ব'লে মনে করি, এবং তাই আমরা শক্তির উপাসক। মহাত্মাজীর অহিংস শক্তি যদি ব্যবহার করতে পারতাম, তা হ'লে তাই করতাম; কিন্তু দেখলাম, তা পারব না। তাই যা পারব তাই করতে যাচ্ছি—কারণ মহাত্মাজীই বলেছেন—Where there is only a choice between cowardice and violence I would advise violence.... এখন চুপ ক'রে ব'সে থাকাটা ভীরুতা হবে—পারিস তো বুঝিয়ে দিস ওকে এসব।

অশরীরী বড়দা অন্তর্হিত হইলেন। ছট্টু চা লইয়া প্রবেশ করিল।

যতীন। বড়দা-মেজদা চ'লে গেলেন?
ছট্টু। হাঁ হুজুর।
যতীন। রুমি কোথা?
ছট্টু। তিনি আগেই বেরিয়ে গেছেন।

ছট্টু দুইজনকে চা দিয়া বাহির হইয়া গেল। শৈলেন চায়ে একটা বড়-গোছের চুমুক দিয়া যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। যতীন অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে চা খাইতে লাগিল।

শৈলেন। দেখ যতীন, তোমার মেজদা যে আমাকে অপমান করলেন তাতে আমার দুঃখ নেই, কারণ কমিউনিস্ট হয়েছি যখন, তখন অপমানই আমাদের অঙ্গের ভূষণ। [হাসিলেন] তা ছাড়া মেজদাকে ছেলেবেলা থেকে দেখছি তো, চিরকালই ওই রকম। কিন্তু চড়ের চেয়ে বেশি লাগল কি জান?

যতীন। কি?

শৈলেন। তোমার বড়দার মুচকি হাসিটা। ছুরির চেয়েও তীক্ষ্ণ। মেজদার সঙ্গে ঘুষোঘুষি ক'রে কোনদিন হয়তো তাঁকে আমাদের দলে টানলেও টানতে পারি, কিন্তু তোমার বড়দা সাংঘাতিক। ঘাড় ফিরিয়ে নির্নিমেষে চেয়ে আছে অতীতের দিকে, কিছুতেই সে ঘাড় ফেরানো যাবে না। বেশি জোর করলে ভেঙে যাবে, তবু নুইবে না। পাথরের তৈরি বিরাট একটা 'ফসিল' যেন। আচ্ছা যতীন, তুমি তো এ যুগের ছেলে, তুমিও কি বিশ্বাস কর না যে, সামাজিক বৈষম্য দূর করাই আমাদের সর্বপ্রধান কাজ হওয়া উচিত? সাম্য না হ'লে স্বরাজের কোনও মানে হয়?

যতীন। বৈষম্য কোনও দিন দূর হবে ব'লে মনে করি না। তবে যে স্বরাজ আমি কামনা করি, তাতে সাম্য না থাকলেও প্রতিটি লোকের স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে। খাওয়া, পরা, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের অভাবে কেউ কষ্ট পাবে না, সকলেই সমান সুযোগ পাবে বড় হওয়ার। আর সবচেয়ে বেশি কি চাই জানেন—প্রত্যেকটি ভারতবাসী ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকবে। লোভে লালায়িত হবে না, হিংসায় জর্জরিত হবে না। ঐশ্বর্য নয়, শান্তিই হবে তার কাম্য।

শৈলেন। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকলে কি কোনও সমাজের উন্নতি হয়?

যতীন। ভারতবর্ষের শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা থাকবে। তা আধিভৌতিক নয়, আধ্যাত্মিক; ভোগে নয় ত্যাগে।

শৈলেন। তুমি দেশসুদ্ধ সবাইকে তা হ'লে লেংটি পরিয়ে সন্ন্যাসী বানাতে চাও নাকি?

যতীন। [হাসিয়া] আমি বানাতে চাইলেও হবে না, সন্ন্যাসী হওয়া অত সহজ নয়। তবে ত্যাগের আদর্শকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ ব'লে যদি মেনে নেয় সকলে, তা হ'লে সন্ন্যাসী না হতে পারলেও অনেক ভদ্রলোক হবে, সমাজে শান্তি থাকবে। ঐশ্বর্য লোটবার জন্যে

পৃথিবীব্যাপী এই যে কদর্য ছুড়োছুড়ি মারামারি রক্তারক্তি চলেছে, এর থেকে রক্ষা পাবে সমাজ।

শৈলেন। তোমার ত্যাগের আদর্শ অন্য দেশকে যদি উদ্বুদ্ধ না করতে পারে? তারা যদি এসে আক্রমণ করে?

যতীন। ত্যাগের আদর্শ থাকবে ব'লে যে দেশরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না, তা তো নয়। আদর্শ ক্ষত্রিয়সমাজ গ'ড়ে তুলতে হবে। তারা যুদ্ধ করবে নিজের দেশ রক্ষা করবার জন্যে, অপর দেশ লুণ্ঠন করবার জন্যে নয়।

শৈলেনবাবু কিছুক্ষণ স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

শৈলেন। তোমার এই স্বপ্ন সফল হবে ব'লে মনে কর?

যতীন। আশা করি।

শৈলেন। কি ক'রে হবে, শুনি?

যতীন। শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল সংস্কার ক'রে। তা করবার আগে অবশ্য দেশের স্বাধীনতা চাই।

শৈলেন। কি উপায়ে পাবে সে স্বাধীনতা?

যতীন। স-হিংস অ-হিংস যে কোনও উপায়ে।

শৈলেন। এর মধ্যে কোন্‌টা ভাল মনে কর তুমি?

যতীন। ভারতবর্ষের আদর্শই হচ্ছে প্রেম। সুতরাং অহিংস উপায়টাই ভাল ব'লে মনে করি। কিন্তু সকলের পক্ষে সে পথে চলা সম্ভব না-ও হতে পারে। না যদি হয়, তা হ'লে স-হিংস উপায় অবলম্বন ক'রেও স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। মোট কথা, স্বাধীনতা চাইই—স্বাধীনতা না পেলে কিছুই হবে না।

ছটু প্রবেশ করিল।

ছট্টু। শৈলেনবাবু, আপনাকে বাড়ি থেকে ডাকতে এসেছে। মাইজীরা ভয় পেয়েছে বড়।

শৈলেন। ও, আচ্ছা, উঠি তা হ'লে ভাই।

উঠিলেন। যতীনও উঠিয়া দাঁড়াইল।

শৈলেন। তোমরা সব মহৎ লোক, আকাশচুম্বী তোমাদের আদর্শ। আমরা মাটির মানুষ, আমাদের কারবার ছোটলোক নিয়ে। আমাদের তোমরা ঘৃণা করতে চাও, কর—

যতীন। কি যে বলেন শৈলেনদা!

তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল।

যতীন। আপনাকে ঘৃণা করতে পারি কখনও? আমাদের সঙ্গে মতে না মিললেও সারাজীবন আপনি যে দেশের কাজই করেছেন, তা কি ভুলতে পারি কখনও? তা ছাড়া ঘৃণার কোনও স্থানই নেই আমার আদর্শে, আমি কাউকে ঘৃণা করি না।

শৈলেন। তুমি কাউকে ঘৃণা কর না?

যতীন। না।

শৈলেন। কথাটা শুনতে ভাল, কিন্তু— আচ্ছা, চলি।

যতীন। রাগ ক'রে যাচ্ছেন না তো শৈলেনদা? [পুনরায় জড়াইয়া ধরিয়া] বলুন, আপনি ব'লে যান—

শৈলেন। না না, রাগ করব কেন? আহা, ছাড়্ না। কি যে অবুঝ তুই—

নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। বাহিরে গিয়া হাত দিয়া চোখটা মুছিয়া ফেলিলেন। যতীনের ব্যবহারে তাঁহার চোখে

জল আসিয়া পড়িয়াছিল। যতীন দেখিল, টিকটিকি ফিরিয়া আসিয়াছে। বিমর্ষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

টিকটিকি। আচ্ছা, তোমার ওই শৈলেনবাবু আমার কিছু উপকার করতে পারবেন ?

যতীন। কেন, কি হ'ল তোমার ?

টিকটিকি। আমার টিকটিকিনী পালিয়ে গেল।

যতীন। কোথায় ?

টিকটিকি। আর একটা টিকটিকির সঙ্গে। [সক্ষোভে] তোমরা কেন যে জানলার ওপরে টিনের 'সান-শেড' লাগাতে গেছ, বুঝি না। একটা গুণ্ডা এসে আশ্রয় নিয়েছে।

যতীন। গুণ্ডা !

টিকটিকি। হ্যাঁ গো। ইয়া কেঁদো মোটা গুণ্ডা একটা। ওদিকের সমস্ত দেওয়ালটা জুড়ে রাহাজানি ক'রে বেড়াচ্ছে, কারও ঘেঁষবার উপায় নেই। টিকটিকি তো নয়, যেন কুমীর একটা।

যতীন। কই, দেখি নি তো !

টিকটিকি। [সশ্লেষে, তাহার কথার অনুকরণ করিয়া] কই, দেখি নি তো ! তুমি আবার আমার দুঃখ কবে দেখতে পাও ? নিজের দিকেই তো সারা দৃষ্টি ফিরিয়ে ব'সে আছ সর্বক্ষণ। স্বার্থপর কোথাকার ! একটু আলো জ্বেলেও তো উপকার করতে পার না। না খেয়ে খেয়ে রোগা হয়ে গেলাম। খেতে পেলে আমিও অমনই কেঁদো মোটা হতাম। তা হ'লে কি আমার টিকটিকিনী পালায় ! আমার এ দুর্দশার জন্যে দায়ী তুমি।

যতীন। আমি ! বল কি ?

টিকটিকি। হ্যাঁ, তুমি ছাড়া আবার কে ?

যতীন। আমার আলোর উপর ভরসা ক'রে ব'সে আছ কেন ? বাইরের পৃথিবীতে চ'রে বেড়াও না, যেমন আর সবাই করছে।

টিকটিকি। তা পারলে আর ভাবনা ছিল না। ঘরে বাইরে সব জায়গায় আমাদের এলাকা ঠিক করা আছে, একজনের এলাকায় আর একজনের প্রবেশ নিষেধ। বাইরে যাব কি, তোমার ওই জানলার চৌকাঠের কাছ পর্যন্ত ঘেঁষবার জো নেই, ওত পেতে ব'সে আছে গুণ্ডাটা। একমাত্র উপায়—গায়ের জোর বাড়ানো, কিন্তু খেতে পাচ্ছি না, জোর বাড়বে কি ক'রে? তোমার উপর আর ভরসা নেই, দেখি শৈলেনবাবুর সঙ্গে আলাপ ক'রে—শুনেছি উনি অনেক অত্যাচারীকে জব্দ করেছেন।

যতীন। মানুষ-অত্যাচারীকে জব্দ করেছেন। টিকটিকি-অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কিছু করেছেন ব'লে তো শুনি নি।

টিকটিকি। মানুষ-অত্যাচারীর বিরুদ্ধেই আমি নালিশ করব। ওঁকে ব'লে তোমাকে বাধ্য করব আমি আলো জ্বেলে রাখতে। হেঁ-হেঁ, আজকাল আর সেদিন নেই যে, যা খুশি তাই করবে। তুমি কিনেছ ব'লে ও আলো যে একলা তোমারই, সে আইন নেই আজকাল—হেঁ-হেঁ—শৈলেনবাবুকে ধ'রে দেখ না—

যতীন। [হাসিয়া] শৈলেনবাবুকে ধরবার দরকার নেই, আমি আলো জ্বেলে রাখব।

টিকটিকি। [গদগদ] রাখবে? সত্যি? সত্যি বলছ?

যতীন। রাখব।

টিকটিকির মনের আনন্দ পুচ্ছে প্রকট হইল।

টিকটিকি। [সানুনয়ে] আর একটি উপকারও কর না তা হ'লে।

যতীন। আবার কি?

টিকটিকি। ওই গুণ্ডাটাকে তাড়িয়ে দাও না। তোমার ওই জানলার টিনটার পাশে ব'সে আছে। তুমি উঠে এক তাড়া দিলেই পালাবে। তোমার ওই লাঠিটা তুলে যদি খোঁচা দাও একটা, তা হ'লে তো বাছাধন একেবারে—

যতীনের মনে হইল, টিকটিকিটার উপর্যুপরি রূপান্তর ঘটিতেছে। (প্রথমে সে হইল জয়চন্দ্র, তাহার পর বলবন্ত রাও, তাহার পর মানসিংহ, তাহার পর উমিচাঁদ, তাহার পর মীরজাফর···) যতীনের সমস্ত চিত্ত গ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সে আর চাহিয়া থাকিতে পারিল না, চোখ বুজিল। তাহার সমস্ত অন্তর যেন নীরব ভাষায় বলিতে লাগিল, হে সুন্দর, কোথায় তুমি, এস, আর কত বিলম্ব ? বাহিরে অনেক দূরে শোনা গেল—ফটিক জল—ফটি—ক জল। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়াই বসিয়া রহিল। তাহার পর যখন চোখ খুলিল, তখন অস্তায়মান সূর্যের আরক্তিম কিরণে সমস্ত ঘর উদ্ভাসিত···এবং সেই স্বর্ণালোক-পরিবেষ্টনীতে দাঁড়াইয়া আছে পুরুষবেশিনী একটি নারী। অপরূপ রূপসী। নয়নে বহ্নি, পৃষ্ঠবিলম্বিত কেশদামে ঝঞ্ঝার মেঘ, মস্তকে মুকুট, হস্তে কৃপাণ, অঙ্গে বর্ম, এবং সমস্ত মণ্ডিত করিয়া এক অপূর্ব পবিত্রতা—নির্মল, অপাপবিদ্ধ।

যতীন। কে আপনি ?

রূপসী। আমাকে চেন না ?

যতীন। মনে হচ্ছে চিনি চিনি, কিন্তু মনে করতে পারছি না ঠিক।

রূপসী। [ঈষৎ হাসিয়া] ছেলেবেলায় চিনতে খুব, দক্ষিণাবাবু আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন, মনে পড়ছে ? আমি রূপকথার কিরণমালা। অরুণ-বরুণের বোন। অরুণের তলোয়ারে মরচে ধরেছে, বরুণের ধনুকের ছিলে ছিঁড়ে গেছে। মায়ার মোহে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তারা সব হয়ে গেছে এখন পাথর। আমি চলেছি তাদের উদ্ধার করতে। তোমার জয়চন্দ্র উমিচাঁদ মীরজাফররাও পাথর হয়ে প'ড়ে আছে সেখানে। সবাইকে উদ্ধার ক'রে আনব।

যতীন। কোথায় সে জায়গা ?

রূপসী। সব ভুলে গেছ দেখছি। মায়া-পাহাড়, যেখানে রূপোর গাছে সোনার ফল ফলে, মুক্তা-গলা জল ঝরে মুক্তি-ঝরনা

থেকে, হীরের গাছে সোনার পাখি গান গায়, যেখানকার রাস্তায় কাঁকর নেই, তার বদলে ছড়িয়ে আছে চুনি পান্না মণি মাণিক্যের দানা। এই সবের লোভে সবাই ছুটে গিয়েছিল সেখানে, কিন্তু মাথা ঠিক রাখতে পারে নি, প্রাণহীন পাথরে পরিণত হয়ে গেছে সব। আমি চলেছি তাদের উদ্ধার করতে। মুক্তি-ঝরনার মুক্তা-গলা জল ছিটিয়ে তাদের বাঁচাব—তারপর ডঙ্কায় দেব ঘা। চললাম। ভেবো না, সবাই বাঁচবে আবার।

ঘড়ি। রূপ নিক, রূপ নিক, রূপ নিক, রূপ নিক…

কিরণমালা চলিয়া গেল। যতীনের মনে হইল, ওই যে আকাশের গায়ে বহুদূরে দেখা যাইতেছে—মেঘের স্তূপ নয়, মায়া-পাহাড়। দুর্গম, দুরারোহ। অন্ধকার নামিতেছে…অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া আছে ঝঞ্ঝা মেঘ, বিদ্যুৎ বজ্র, সরীসৃপ শ্বাপদ, পিশাচ প্রেতিনীর বিভীষিকা। কিরণমালা চলিয়াছে, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, নিষ্কম্প অগ্নিশিখার মত আঁধার ভেদ করিয়া চলিয়াছে সে…। দ্বারপ্রান্তে শব্দ হইল। যতীন ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, বড় বউদি প্রবেশ করিতেছেন। বড় বউদি ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনী। ধপধপে ফরসা রঙ। কপালের মাঝখানে ছোট একটি উলকির টিপ। টকটকে লালপেড়ে শাড়ি, মাথা-ভরতি সিঁদুর। হাতে কয়েকগাছা করিয়া সোনার চুড়ি আছে, কিন্তু শাঁখাটাই সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হাতে একটি পানের ডিবা। পরিপুষ্ট গোল মুখখানিতে মাতৃত্ব যেন মূর্ত। চোখের দৃষ্টিতে শঙ্কা বা ক্ষোভ নাই, অধীরতাও নাই। বরং একটা শান্ত অথচ সকৌতুক ঔৎসুক্য চোখের কোণে উঁকি দিতেছে। ভাবটা যেন—সাড়ম্বরে তোমরা অনেক আয়োজনই তো করিলে, শেষ পর্যন্ত কি কর দেখি! তিনি নির্নিমেষে কয়েক মুহূর্ত যতীনের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর একটু হাসিলেন। তাঁহার ভাব-ভঙ্গীতে কেমন যেন একটা চাপা গোপন ভাব। যেন প্রয়োজন হইলে তিনি যাহা করিবেন, ঠিক করিয়া

ফেলিয়াছেন এবং সেইজন্য নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন—কিন্তু সে কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে চান না।

বড় বউদি। ছোট বীরপুরুষটির খবর নিতে এলাম।

যতীন। [হাসিয়া] আমি ঠিক আছি।

বড় বউদি। আমরাও বেঠিক নেই। আচ্ছা, রুমি কোথা গেল, তাকে দেখতে পাচ্ছি না!

যতীন। [একটু ইতস্তত করিয়া] সে নোয়াখালি চ'লে গেছে।

বড় বউদি। ওমা, সে কি! কখন?

যতীন। এই একটু আগে।

বড় বউদি। তোমাকে ব'লে গেল?

যতীন। হ্যাঁ।

বড় বউদি। মানা করলে না?

যতীন। করলাম, শুনলে না।

একটা সূক্ষ্ম গর্বের আভা বড় বউদির সারামুখে ছড়াইয়া পড়িল। ভাষায় কিন্তু তিনি যাহা বলিলেন, তাহা অন্যরকম।

বড় বউদি। একলা এমন ভাবে যেতে দেওয়া ঠিক হয় নি। তোমার দাদারা শুনলে রাগ করবেন।

যতীন। কি করব, জোর ক'রে চ'লে গেল। চেন তো তাকে।

বড় বউদি। চিনি না আবার, ডাকাত একটা।

যতীন। অমল বিমল কোথা?

বড় বউদি। তোমার দাদা তাদের রেখে গেছেন নাকি! তারাও পা বাড়িয়েছিল, বলামাত্রই দু ভাই বল্লম নিয়ে তৈরি। [হাসিলেন] বাবা ভাগ্যে এ সময় কাশীতে, তিনি থাকলে কক্ষনো যেতে দিতেন না ওদের। আর তাই নিয়ে এক কাণ্ড হ'ত বাড়িতে। তোমাকেও

যেতে হ'ত, কেবল আমাদের আগলাবার জন্যে তোমাকে রেখে গেলেন। আমাদের নিয়েই বিপদ তোমাদের, আমরা হয়েছি তোমাদের পায়ের বেড়ি। বেড়ি না পরলে চলেও না যে তোমাদের, [হাসিয়া] তোমার জন্যেও বেড়ির যোগাড় করতে হবে এবার একটা। বংশ রাখতে হবে তো। আমার ছেলে দুটি তো যুদ্ধে গেল, ফিরবে কি না ভগবানই জানেন। তোমার মেজ বউদির যা ভাবগতিক, মনে হচ্ছে, দশ বছরেও হ'ল না যখন, তখন আর হবে না বোধ হয় কিছু। আর সেজ বউয়ের ছেলে দুটি তো নোয়াখালিতে মামার বাড়ি গেছে। যা খবর এসেছে, তাতে—

যতীন। খবর এসেছে নাকি ?

বড় বউদি। এখনই পেলাম। তোমার সেজদা সেজ বউদি শোনে নি এখনও। [চুপিচুপি] পরেশবাবুর স্ত্রী এসেছিলেন এখনই, তাঁর মুখেই শুনলাম। পরেশবাবু নিজের বোনের খবর আনতে ছুটেছিলেন কলকাতায়, সেখানে নোয়াখালির কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাদের একজন নাকি বলেছে যে, সেজ বউয়ের বাপের বাড়ির একটি প্রাণী বাঁচে নি, পুড়ে মরেছে সবাই।

নির্নিমেষে গম্ভীর মুখে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর একটু হাসিলেন, কিন্তু নির্নিমেষে চাহিয়াই রহিলেন।

যতীন। বউদি, তুমি নীচে গিয়ে বেহারী কিংবা ছট্টু—কাউকে দিয়ে খিড়কির দিকে বৈঠকখানার ছাতটায় বাঁশের সিঁড়িটা লাগিয়ে দিতে বল।

বড় বউদি। কেন, কি হবে ?

যতীন। আমার ঘর থেকে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে বৈঠকখানার ছাতে নামা যায়, সেখান থেকে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে খিড়কি-দরজায় যাওয়া যাবে।

বড় বউদি। তা না হয় যাবে, কিন্তু কেন?

যতীন। যদি বাড়ি ঘিরে ফেলে, তা হ'লে খিড়কি দিয়ে আমরা সরকারদের বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারব।

বড় বউদি। ও, পালাবার বন্দোবস্ত! আমি তো প্রাণ থাকতে পালাব না। অনেকদিন বেঁচেছি, কি হবে আর বেঁচে? সবাই যদি ম'রে যায়, আমি একা বেঁচে করবই বা কি? [হাসিয়া] আমার ভয় নেই।

যতীন। আসল ভয় প্রাণের নয়, মানের।

বড় বউদি। [হাসিয়া] সে ভয়ও নেই। মান রাখতে জানলে কেউ নিতে পারে না। [ডিবা খুলিয়া এক খিলি পান মুখে পুরিলেন] তুমি নেবে নাকি এক খিলি? বীণা কি যে ছাই ক'রে সেজেছে পানগুলো, দেখি, ভাল ক'রে নিজেই সাজি গিয়ে। তুমি তো কাব্য নিয়ে থাকবে! আমরা পান চিবুই ব'সে ব'সে, কি আর করব! রান্নাঘরেও যেতে হবে একবার। সকালে তো জানি না, এত কাণ্ড হবে, মাংস আনিয়েছিলাম—। [হাসিয়া] তোমার দাদা পোলাও-মাংসের ফরমাশ দিয়ে গেছেন। ফিরে এসে খাবেন। ফিরে এসে নোয়াখালির খবর শুনলে খাওয়া অবশ্য মাথায় উঠবে জানি, কিন্তু রেঁধে রাখতে হবে। [মুচকি হাসিয়া] চেন তো মানুষটিকে, হুকুমের নড়চড় হবার উপায় নেই। যাই। আর একটু চা পাঠিয়ে দেব নাকি?

যতীন। না, এখন থাক্, এই তো খেলাম। তুমি সিঁড়িটা লাগিয়ে দিতে ব'লো। সাবধান থাকাই ভাল।

বড় বউদি। আচ্ছা। কি বীরপুরুষের উপরই ভার দিয়ে গেছেন কর্তারা!

আর একবার মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন। যতীন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার চোখের সম্মুখে ধীরে ধীরে মূর্ত হইয়া উঠিল সেজদার দুই ছেলে—নীলু ও বিলু। অনিন্দ্যকান্তি কিশোর দুইটি।

জীবন্ত প্রাণের উন্মুখ আগ্রহ তাহাদের সর্ব অঙ্গে পরিস্ফুট। চোখের দৃষ্টি জ্বলজ্বল করিতেছে। তাহারা কি যেন বলিতে যাইতেছিল, সহসা আগুনের শিখা আসিয়া তাহাদের ঘেরিয়া ফেলিল। তাহাদের চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল—হঠাৎ আগুন কেন! তাহারা যতীনের দিকে চাহিয়া আরও আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহাদের চারিদিকে আগুন, অথচ ছোটকাকা নির্বিকার হইয়া বসিয়া আছেন!

নীলু। উঃ—উঃ—এ কি! চারদিক বন্ধ যে—কোথা যাই? ছোটকাকা, কপাটটা খুলে দাও, কপাটটা খুলে দাও।

বিলু। ছোটকাকা, ও ছোটকাকা, উঃ, কি করি আমরা?

নীলু। কাপড়ে আগুন ধ'রে গেল—বাঁচাও—পুড়ে যাচ্ছি—

বিলু। বাঁচাও ছোটকাকা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—শুনতে পাচ্ছ না? বাঁচাও আমাদের, বাঁচাও—বাঁচাও—

আগুনের লেলিহান শিখা লকলক করিয়া তাহাদের গ্রাস করিয়া ফেলিল। শিখা ভেদ করিয়া চীৎকার উঠিতে লাগিল—বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁচাও। মনে হইল, স্বয়ং অগ্নিই যেন তারস্বরে আর্তনাদ করিতেছেন। যতীন উত্তেজনাভরে উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু পরমুহূর্তেই লজ্জিত হইয়া বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। নিরুপায় ক্ষোভে তাহার সমস্ত চিত্ত মথিত হইতে লাগিল। চোখের সম্মুখে সমস্ত দৃশ্যটা ফুটিয়া উঠিতেছে, অথচ কিছু করিবার উপায় নাই। বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁচাও— চীৎকার এখনও থামে নাই। বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁচাও— চীৎকার তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল। আকাশে বাতাসে, নদীতে প্রান্তরে, উর্ধ্বে নিম্নে, অন্তরে বাহিরে কেবল —বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁচাও। আগুন নিবিল, কিন্তু চীৎকার থামিল না। অবশেষে চীৎকারটা যেন মূর্তি ধরিয়া অগ্নিস্তূপ হইতে বাহির হইয়া আসিল··· সমস্ত দেহ জ্বলন্ত-অঙ্গারময়। সেই জ্বলন্ত-অঙ্গারময় মূর্তি যতীনের দিকে আগাইয়া আসিল।

অঙ্গারমূর্তি। এখনও ব'সে আছ? বাঁচাও আমাদের,—সর্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল যে, জ্ব'লে পুড়ে খাক হয়ে গেল। ম'রে গেছি, কিন্তু জ্বালা কমছে না। জ্বালা কমিয়ে দাও, শিগগির জ্বালা কমিয়ে দাও।

যতীন। [অসহায়ভাবে] কি করলে কমবে, তা তো জানি না।

অঙ্গারমূর্তি। [সশ্লেষে] এখনও জান না?

যতীন। না।

হাহাকার করিতে করিতে অঙ্গারমূর্তি অদৃশ্য হইয়া গেল। অগ্নিকাণ্ডও ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হইল। যতীন বুঝিতে পারিল, যাহা সে এতক্ষণ লেলিহান অগ্নিশিখা বলিয়া মনে করিতেছিল, আসলে তাহা রক্ত-কিরণ-রঞ্জিত সন্ধ্যার মেঘ—খোলা জানালা দিয়া দেখা যাইতেছিল। সূর্য অস্ত গিয়াছে··· চতুর্দিকে অন্ধকার নামিতেছে। সমস্ত ঘর অন্ধকারে ভরিয়া গেল। নিবিড় অন্ধকারে আত্মনিমগ্ন হইয়া যতীন কি যেন খুঁজিতেছিল। সহসা শুনিতে পাইল—আলো জ্বাল। হাত বাড়াইয়া 'সুইচ' টিপিতেই প্রস্তর-তরুণীর ঊর্ধ্বোত্থিত বাহুর উপর 'বাল্‌ব'টা জ্বলিয়া উঠিল। যতীন দেখিতে পাইল, আলোকিত দেওয়ালে টিকটিকি লোলুপ আগ্রহে বসিয়া আছে।

টিকটিকি। কতক্ষণ থেকে বলছি, আলো জ্বাল, আলো জ্বাল—শুনতেই পাচ্ছ না। আশ্চর্য! ঘরে ঘরে আলো জ্ব'লে উঠেছে, পোকাগুলো সব চ'লে গেল বোধ হয় এদিকে ওদিকে।

একটা মানসিক অবসাদ যতীনকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। কিছুই করিতে না পারিয়া এবং করিবার আশা নাই অনুভব করিয়া তাহার পৌরুষ যেন ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। নিজের পৌরুষকে মর্যাদা দান করিবার জন্যই সে টিকটিকির উপকারে প্রবৃত্ত হইল।

যতীন। ব্যস্ত হচ্ছ কেন, অনেক পোকা আসবে এখনই। গুণ্ডাটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি আমি। কোন্‌খানে আছে বললে?

টিকটিকি। [সাগ্রহে] দেবে? দেবে? ওই 'সান-শেড'টার ঠিক নীচেই আছে, লাঠিটা নিয়ে যাও।

যতীন উঠিয়া জানালার কাছে গেল এবং 'সান-শেড'এর নীচে বলিষ্ঠ টিকটিকিটাকে দেখিতে পাইল। অদূরে টিকটিকিনীও রহিয়াছে।

যতীন। তোমার টিকটিকিনীও রয়েছে। তুজনকেই তাড়িয়ে দেব?

টিকটিকি। আরে না না, টিকটিকিনীকে তাড়াবে কেন, গুণ্ডাটাকে তাড়িয়ে দাও।

যতীন ঘরের কোণ হইতে ছড়িটা তুলিয়া লইল এবং বলিষ্ঠ টিকটিকিটাকে নীচে ফেলিয়া দিল।

প্রস্তর-তরুণী। অন্যায় করলে।

যতীন চমকাইয়া তাহার দিকে চাহিল।

টিকটিকি। হি-হি-হি-হি—

অদ্ভুত একটা হাসি হাসিতে লাগিল।

যতীন। [প্রস্তর-তরুণীকে] অন্যায় করলাম নাকি?

প্রস্তর-তরুণী। অন্যায় করলে না? এই একই অপরাধে গুণ্ডাদের 'পিশাচ' বলেছ তোমরা—তারাও তেতলার ছাদ থেকে মানুষ ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে নীচে।

টিকটিকি। [প্রস্তর-তরুণীকে] তোমার আস্পর্ধা বড্ড বেড়েছে

দেখছি। নির্জীব পাথর হয়ে বেশ তো জীবন্ত প্রাণীদের সমালোচনা ক'রে যাচ্ছ! তোমার পাথুরে বুদ্ধিতে যা অন্যায়, আমাদের জীবন্ত বুদ্ধিতে তা অন্যায় নয়। [যতীনের দিকে চাহিয়া] কি বল!

যতীন কোন উত্তর দিল না। তাহার চোখের সামনে পর পর দুইটা ছবি কেবল মূর্ত হইয়া মিলাইয়া গেল—মিস্টার চার্চিল এবং জেনারেল স্মাট্‌স্। চতুর্দিকে নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। যতীনের মনে হইল, সব যেন ক্রমশ ঘন হইয়া আসিতেছে··· আকাশ বাতাস সব পাথর হইয়া গেল বুঝি··· একটা নিরুদ্ধ নির্বাক আকুলতা আত্মপ্রকাশের বেদনায় যেন টনটন করিতেছে··· এইবার ফাটিয়া যাইবে বুঝি··· প্রস্তর-তরুণী কথা কহিয়া উঠিতেই যতীন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল।

প্রস্তর-তরুণী। [সানুনয়ে] জীবন্ত ক'রে তোল আমাকে। কিরণমালাকে ডাক, মুক্তি-ঝরনার জল ছিটিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে তুলুক।

যতীন। সে কি আর আসবে?

প্রস্তর-তরুণী। তুমি ডাকলেই আসবে। এই উপকারটি কর আমার, এত লোকের এত উপকার কর তুমি—

টিকটিকি। ঠিক ঠিক,—ভারি উপকারী লোক। সভ্য মানুষের লক্ষণই ওই। হ্যাঁ, ভুলে যাবার আগে কথাটা ব'লে ফেলি তোমাকে। উপকারের ঋণটাও কিছু শোধ হয়ে যাক। [চুপিচুপি] তোমার বড় বউদিকে লক্ষ্য করেছিলে ভাল ক'রে?

যতীন। লক্ষ্য করবার মত কিছু ছিল নাকি?

টিকটিকি। ছিল বইকি। পেট-কাপড়ের তলায় চকচকে ছোরা ছিল একটা।

যতীন। কই, দেখি নি তো!

টিকটিকি। [সশ্লেষে] তা দেখবে কেন, ওই পাথরের মূর্তিটার দিকেই হাঁ ক'রে চেয়ে আছ কেবল সর্বক্ষণ, আর বেফয়দা বকরবকর করছ ওর সঙ্গে··· থাম থাম, পোকা এসেছে একটা।

দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট কালো পোকা আসিয়া বসিয়া ছিল। টিকটিকি সন্তর্পণে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

প্রস্তর-তরুণী। কিরণমালাকে ডাক। তুমি ডাকলে ঠিক আসবে। তোমাদের ডাকে উর্বশী উঠে আসে সিন্ধু থেকে, গঙ্গা নেমে আসে স্বর্গ থেকে ধরণীর ধূলিতে। কিরণমালাও আসবে, তুমি ডাকলেই আসবে। [সানুনয়ে] ওগো, আমাকে সঞ্জীবিত কর, লোভে, মোহে, অশিক্ষায় পাথর হয়ে আছি কতকাল থেকে, উদ্ধার কর আমায়, দয়া কর, ডাক, কিরণমালার সোনার ঝারিতে ক'রে নিয়ে আসুক সে মুক্তি-ঝরনার জল, ছিটিয়ে দিক আমার সর্বাঙ্গে। চুপ ক'রে আছ কেন? [অধার-ভাবে] ডাকছ না কেন? ডাক।

যতীন। ডাকলে আসবে না, সময় হ'লে আসবে। পরিবেশ অনুকূল হ'লে নিজেই আসবে সে।

সহসা চতুর্দিকে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। যতীনের মনে হইল, কিরণমালা বুঝি আসিতেছে, তাহারই বুঝি এ অভিনন্দন··· সে সাগ্রহে দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল··· কেহ আসিল না···.শঙ্খঘণ্টারব উগ্র হইতে উগ্রতর হইয়া উঠিল··· অভিনন্দন নয়, একটা ভীত আর্ত হাহাকার যেন মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। অন্ধকারকে চিরিয়া তীক্ষ্ণ তীব্র স্বরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল কয়েকবার। 'জয় হিন্দ্', 'বন্দে-মাতরম্', 'জয় হিন্দ্', 'বন্দে-মাতরম্', 'জয় হিন্দ্', 'বন্দে-মাতরম্'—শতকণ্ঠ হইতে উৎসারিত হইয়া মুখরিত করিয়া তুলিল আকাশ-বাতাস-অন্ধকারকে। আলুথালু বেশে মেজ বউদি ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বন্ধ্যা নারী। দেখিলে মনে হয়, বয়স উনিশ-কুড়ির বেশি নয়। আঁটসাট গড়ন। সুশ্রী। নিপুণ প্রসাধনের জন্য আরও সুশ্রী দেখাইতেছে। তাঁহার বিস্ফারিত বড় বড় চোখের দৃষ্টিতে আতঙ্ক।

মেজ বউদি। শুনছ ঠাকুরপো, ছট্টু বলছে, গুণ্ডার দল ঢুকে পড়েছে আমাদের পাড়ায়।

যতীন। ভয় কি, ঢুকুক না।

মেজ বউদি। আমার বড় ভয় করছে।

যতীন। পাগল নাকি, ভয় কি? বড় বউদি কোথায়?

মেজ বউদি। তিনি পোলাও চড়িয়েছেন, তাঁর ভয়-ডর নেই, রান্নাঘরে বেশ নিশ্চিন্ত মনে মাংসের আলু কুটছেন ব'সে ব'সে। আর সেজ বউ আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে মড়ার মত শুয়ে আছে, তোমার সেজদা ঠাকুর-ঘরে। আমার একলা বড্ড ভয় করছে।

যতীন। চাকরগুলো কোথা?

মেজ বউদি। তারা গেটের কাছে বর্শা বল্লম নিয়ে ব'সে আছে লুকিয়ে।

যতীন। তবে আর ভয় কি, আমার কাছেও বন্দুক আছে, একটা নয়, দু-দুটো। ভয় কি?

বাহিরে শঙ্খ, ঘণ্টা, জয় হিন্দ্, বন্দে মাতরম্ আরও উদ্দাম হইয়া উঠিল··· মেজ বউদি যতীনের বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন···হঠাৎ বাহিরের উদ্দাম শব্দটা থামিয়া গেল··· একটা মোটরকারের শব্দ স্পষ্ট হইয়া উঠিল··· যতীন তাড়াতাড়ি স্মেলিং-সল্টের শিশিটা আলমারি হইতে বাহির করিয়া মেজ বউদির নাকের কাছে ধরিতেই তিনি উঠিয়া বসিলেন···কাপড়-চোপড় সামলাইয়া লজ্জিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

যতীন। উঠলেন কেন, শুয়ে থাকুন না।

মেজ বউদি। না, আমি যাই। [উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন] আর তো কিছু শোনা যাচ্ছে না। সব থেমে গেল, নয়? ও কিছু নয় বোধ হয় তা হ'লে, নয়? [ভীত হাসি হাসিয়া] আমাদের পাড়ায় কিছু হবে না বোধ হয়, নয়? আমি যাই, দিদি একলা আছেন নীচে।

যতীন। ভয় করে তো এইখানেই থাকুন না।

মেজ বউদি। না, আমি যাই।

মেজ বউদি চলিয়া গেলেন, কিন্তু অশরীরী বেশে পুনরায় প্রবেশ করিলেন।

অশরীরী মেজ বউদি। আমার ভয় দেখে হেসো না ঠাকুরপো। আমার ছেলে মেয়ে নেই, বিদ্যা বুদ্ধি নেই, দেহটা ছাড়া আর আমার কিছু নেই। এই দেহটাকেই ঘ'ষে মেজে, সাজিয়ে গুছিয়ে তোমার মেজদার মত অসুরকে বশ ক'রে রেখেছি। এই দেহটাই আমার যথাসর্বস্ব, সামান্য ফোড়া হ'লেও তাই আমি ভয়ে মরি। এই দেহটাকে নিয়ে গুণ্ডারা ছেঁড়াছিঁড়ি করবে, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না··· এ ছাড়া যে আমার আর কিছু নেই ঠাকুরপো! হেসো না, দয়া কর আমাকে···

মিনতি-ভরা করুণ দৃষ্টি তুলিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন···তাহার পর অদৃশ্য হইয়া গেলেন। যতীন গুণ্ডাদের কথাই ভাবিতে লাগিল। তাহারা মানুষ নয়? মানুষ কি করিয়া এত নৃশংস হইতে পারে?···ঠিক সামনের দেওয়ালেই যতীনের পুস্তকের আলমারি ছিল। আলমারির কপাট খুলিয়া এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ বাহির হইয়া আসিলেন। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় আব্দুল গফ্ফর খাঁ। পরিধানে মূল্যবান মখমলের জরিদার পোশাক, মাথায় মুসলমানী টুপি। চোখের দৃষ্টি আভিজাত্য-মণ্ডিত।

দীর্ঘাকৃতি পুরুষ। ওরা মুসলমান নয়, ওরা মেওয়াটি। আমার রাজত্বকালে ওরা একবার মাথা চাড়া দিয়েছিল, চাবুকের চোটে শায়েস্তা ক'রে দিয়েছিলাম সবাইকে। দিল্লীর তখ্তে কে আছে এখন? ঘুমুচ্ছে নাকি লোকটা? তারই উচিত এদের শাসন ক'রে দেওয়া।

মুসলমানদের বদনাম দিচ্ছ কেন,—এরা মুসলমান নয়, হতে পারে না, —মুসলমান ইমানদার জাত।

যতীন। কে আপনি?

দীর্ঘাকৃতি পুরুষ। আমি দিল্লীর সুলতান ঘিয়াসুদ্দিন বলবন্। আমার শাসনকালে বাংলা দেশে বিদ্রোহ করেছিল তুঘ্রিল। আমার তখন সত্তর বছর বয়স, তবু আমি নিজে গিয়ে সে বিদ্রোহ দমন করেছিলাম। গৌড়ের বাজারে দু'ধারি ফাঁসিকাঠ পুঁতে লটকে দিয়েছিলাম বদমাশ তুঘ্রিলের চরদের। বদমাশকে কখনও খাতির করি নি, কখনও না। এরা মুসলমান নয়, এরা কাফের। বাদাউনের এক আমীর একবার চাবুকের চোটে তার এক গরিব চাকরকে মেরে ফেলে। চাকরের বিধবা আমার দরবারে নালিশ জানাতে আমি কি করেছিলাম জান? ওই বিধবার সামনে সেই আমীরকে চাবকে হত্যা করেছিলাম। মুসলমান ব'লে খাতির করি নি। সে মুসলমান নয়, সে কাফের। [চীৎকার করিয়া] দিল্লীর সুলতান পাঠান ঘিয়াসুদ্দিন বলবন্ আমি—আমি বলছি, ওরা মুসলমান নয়, ওরা বদমাশ কাফের,—বেতমিজ, বেইমান। চীন থেকে স্পেন পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল যে মুসলমান, তারা কাপুরুষ নয়, তারা বীর, তারা খোদার খিদমৎগার, আজাদীর উপাসক…

তাঁহার বাহুর উর্ধ্বোৎক্ষেপে যতীন নিমেষে যেন সুদূর অতীতে ইসলাম-ধর্মের মর্মমূলে নীত হইল।…আরবের মরুভূমি ধুধু করিতেছে। কাছে দূরে ছোট বড় অসংখ্য বালির পাহাড়। আর কিছু নাই, কেবল মরুভূমি আর মরীচিকা। দূর চক্রবালরেখায় আকাশ নামিয়া আসিয়াছে। নীল নির্মল মহাকাশ। সেই মহাকাশের পটভূমিকায় কণ্টকসমাকীর্ণ একটি গোলাপগাছ…তাহাতে গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তরাঙা গোলাপ ফুটিয়া আছে… দূরে একটি উট চলিয়াছে…উটের পিঠে বসিয়া আছেন ইসলাম-জগতের হর্তাকর্তা বিধাতা খলিফা ওমর।

তিনি বৃদ্ধ, কিন্তু অসমর্থ নন। সোজা বসিয়া আছেন, দৃষ্টি সুদূর আকাশে নিবদ্ধ। সঙ্গে একটিমাত্র চাকর, এক বোরা যব, কিছু খেজুর, এক মশক জল এবং একটি কাঠের থালা। আর কিছু নাই।...আরব-সৈন্য জেরুজালেম অবরোধ করিয়াছে। জেরুজালেমের পেট্রিয়ার্ক একটি শর্তে আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছেন—তিনি খলিফা ওমরের কাছে আত্মসমর্পণ করিবেন, আর কাহারও কাছে নয়। খলিফা ওমর তাই চলিয়াছেন। উষ্ট্রপৃষ্ঠে ছয় শত মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। তা হোক, কর্তব্য সর্বাগ্রে।...জেরুজালেমের বাহিরে আরব-সেনাপতিরা তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন। উট আসিয়া থামিল। খলিফা ওমর সবিস্ময়ে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন—ইহারা কাহারা! বহুমূল্য সজ্জায় সজ্জিত অশ্বের সারি, সেনাপতিদের পরিচ্ছদে মখমল রেশম, তাহাতে হীরা মুক্তা জ্বলিতেছে। বৃদ্ধ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, সড়াক করিয়া উটের পিঠ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং মাটি হইতে ঢেলা তুলিয়া তাহাদের দিকে ছুঁড়িতে লাগিলেন। তাঁহাকে এতবড় অপমান? এই সব জরি-জড়োয়ার অর্থ কি? তাঁহার যোদ্ধারা কোথায়? কোথায় সেই মরুচারী বেদুইনরা? তিনি এই সঙের দল লইয়া জেরুজালেমে প্রবেশ করিবেন না। ইহাদের কাছে আত্মসমর্পণ না করিয়া পেট্রিয়ার্ক ঠিকই করিয়াছেন। ঢিল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সুসজ্জিত সেনাপতি-বৃন্দ দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। নিজের ভৃত্যটিকে মাত্র সঙ্গে লইয়া খলিফা ওমর একাই নগর-প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবার পূর্বে যতীনের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলেন। তাঁহার দৃষ্টি যেন বলিয়া উঠিল—ইসলামধর্ম ভোগী গুণ্ডার ধর্ম নয়, ত্যাগী শহীদের ধর্ম। তাহা দুর্বলকে পীড়ন করে না, তাহা অসত্যের কবল হইতে জান কবুল করিয়াও সত্যকে মুক্ত করে।... ধীরে ধীরে আর একটি ছবি ফুটিয়া উঠিল—হুগলির হাজি মহম্মদ মহসিন...অতিশয় নিষ্ঠাভরে স্বহস্তে কোরাণ নকল করিতেছেন... অগাধ সম্পত্তির মধ্যে বাস করিয়াও

তিনি ফকির··· স্বজাতির উন্নতির জন্য সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া গেলেন।··· এ দৃশ্যও মিলাইয়া গেল।··· পর পর কয়েকটা ছবি ফুটিয়া উঠিল। মীর মশার্‌রফ হোসেনের ছবি— 'বিষাদ-সিন্ধু' রচনা করিতেছেন··· 'অগ্নিবীণা' হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন কবি কাজি নজরুল ইসলাম··· আবিদ মিঞা—চমৎকার রামায়ণ গান করিত···

প্রস্তর-তরুণী। আমাকে মুক্ত কর, মুক্ত কর, মুক্ত কর···

যতীন ফিরিয়া দেখিল, উন্মুখ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে প্রস্তর-তরুণী নয়, বন্দিনী সীতা। এ তো তাহার ঘর নয়, এ যে অশোক বন। রাবণ স্মিতমুখে অদূরে দাঁড়াইয়া আছে।

রাবণ। [সীতাকে] যাদের উপর নির্ভর ক'রে এতদিন তুমি আমার দিকে ফিরে চাও নি, এবার সেই রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে বেঁধেছি, ওই দেখ—

লঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্র ধীরে ধীরে মূর্ত হইয়া উঠিল। অসংখ্য শবাকীর্ণ বিরাট প্রান্তর। বহু সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। নাগপাশ-বদ্ধ হত-চেতন রাম-লক্ষ্মণকে ঘিরিয়া বহু বীর বিলাপ করিতেছেন। রাম-লক্ষ্মণের বর্ম বিধ্বস্ত, শরাসন বিক্ষিপ্ত, সর্বাঙ্গ শরবিদ্ধ, মনে হইতেছে, যেন তাঁহারা শরস্তম্ভময়। অসংখ্য নাগ শররূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অদূরে রাবণ দাঁড়াইয়া হাসিতেছে···তাহার দশ মুণ্ডে কামনালুব্ধ লক্ষ চক্ষু জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে···ধীরে ধীরে একটা অদ্ভুত রূপান্তর ঘটিতে লাগিল···রাবণের রূপটা প্রথমে ক্লাইব, পরে লর্ড ডাল্‌হাউসিতে পরিণত হইল···বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা অযোধ্যা বেরার পাঞ্জাব সব একে একে নাগপাশে বাঁধা পড়িতেছে···রাম-লক্ষ্মণ হিন্দু-মুসলমানে রূপান্তরিত হইল। তাহার পর অন্ধকার। অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছে। দূরে ওটা কিসের শব্দ? রাবণের

হাসি, না ইংরেজের কামান? সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া গেল আবার। ভয়াবহ নিস্তব্ধতা। তাহার পর ঝড় উঠিল, কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল কালো কালো বিশাল মেঘ, মেঘের বুকে জ্বলিয়া উঠিল বিদ্যুৎবহ্নি। চরাচর প্রকম্পিত হইয়া উঠিল, মনে হইল, যেন ভূমিকম্পে বসুধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; আকাশেও আলোড়ন; সপ্ত-সমুদ্র গর্জন করিতেছে···বিরাট পক্ষ সঞ্চালন করিয়া উড়িয়া আসিলেন বিনতা-নন্দন গরুড়···গরুড়কে দেখিয়া সর্পকুল পলায়ন করিতেছে···নাগপাশমুক্ত রাম-লক্ষ্মণ পুনরায় ভীম-পরাক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।···গরুড় দেখিতে দেখিতে রূপান্তরিত হইল সিপাহী-বিদ্রোহে···পরাধীনতার নাগপাশ খুলিয়া গেল···হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি যুদ্ধ করিতেছে···নানাসাহেব, আজিমুল্লা খান।···সিপাহী-বিদ্রোহ রূপান্তরিত হইল কংগ্রেসে···সেখানেও হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বদরুদ্দিন তায়েবজি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহম্মদ রহিমতুল্লা সয়ানী, আর. এন. মুধলকর, নবাব সৈয়দ মামুদ, হাকিম আজমল খান, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মৌলানা মহম্মদ আলি, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।···সহসা একটা প্রচণ্ড শব্দ হইল···কংগ্রেস মিলাইয়া গেল···লঙ্কার প্রান্তরে রাম হাহাকার করিতেছেন···রাবণ লক্ষ্মণের বুকে শক্তিশেল হানিয়াছে। রামের হাহাকার ক্রমশ যেন শঙ্খধ্বনিতে পরিণত হইল···চারিদিকে আবার শাঁখ বাজিয়া উঠিয়াছে··· আবার হাহাকার···জয় হিন্দ্, বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ্, বন্দে মাতরম্, জয় হিন্দ্, বন্দে মাতরম,···গুড়ুম গুড়ুম···বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল···জয় হিন্দ্, বন্দে মাতরম্, জয় হিন্দ্, বন্দে মাতরম্···আবার সব স্তব্ধ···একটা মোটর আসিবার শব্দ শোনা গেল।

প্রস্তর-তরুণী। আমাকে মুক্ত কর, মুক্ত কর, মুক্ত কর···

যতীনের মনে হইল, তাহাদেরই বাড়ির গেটের সামনে কলরব উঠিয়াছে। সে তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। বড়দা যে বন্দুক দুইটা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই একটা তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইতে গিয়া সে এক কাণ্ড করিয়া ফেলিল। বন্দুকের নলের ধাক্কায় প্রস্তর-তরুণী মেঝেতে পড়িয়া গিয়া সশব্দে চুরমার হইয়া গেল। অন্ধকার।

…যতীন হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দেওয়ালের কাছে গিয়া আর একটা সুইচ টিপিতেই আলোটা জ্বলিয়া উঠিল। আলোর ঠিক নীচেই এক সারি ছবি ছিল—মহাত্মা গান্ধী, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র। ইঁহারা সকলেই যেন তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গান্ধীজীই প্রথমে হাসিমুখে সম্বর্ধনা করিলেন, তাঁহার ফোকলা দাঁতের হাসিতে শিশুর সরলতা ফুটিয়া উঠিল।

মহাত্মা গান্ধী। তুমি একটু আগেই যা দেখলে তা স্বপ্ন নয়, সত্য, দেশজোড়া এই যে বিক্ষোভ, সত্যিই তা লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ। কিন্তু রাম আজ আত্মবিস্মৃত। লক্ষ্মণের বুকে রাবণ আজ যে শক্তিশেল হেনেছে, তা যে হিন্দুবিদ্বেষ তা সে বুঝতে পারছে না। সেই বিদ্বেষের বিষে আজ মূছিত হয়ে পড়েছে সৌমিত্রি। তাকে বাঁচাতে হবে। শক্তিশেলে লক্ষ্মণ যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, তখন রাম তো তার বুকে গুলি করতে যায় নি। তোমার হাতে তবে বন্দুক কেন?

যতীন লজ্জিত হইয়া পড়িল।

মহাত্মা গান্ধী। [হাসিয়া] মহর্ষি বাল্মীকি ব'লে গেছেন, গন্ধমাদনেই এর ওষুধ আছে। গন্ধমাদন পাহাড় নয়—গন্ধে যা চতুর্দিক আমোদিত করে অথচ যা পর্বতের মত দৃঢ়, সেই বিশুদ্ধ মানব-চরিত্রের নামই—গন্ধমাদন। বিশল্যকরণীও গাছের শিকড় নয়—ওসব

রূপক—যা সত্যিই মানুষকে বিশল্য অর্থাৎ বেদনামুক্ত করে, তার নাম—ভালবাসা, প্রেম। এই গন্ধমাদনের ভার যিনি বহন করতে পারবেন, তিনি শাস্ত্রবিৎ মহাশক্তিশালী আত্মত্যাগী মহাবীর। বন্দুক নয়, তাঁরই এখন প্রয়োজন। তিনি না এলে সীতা উদ্ধার হবে না।

গান্ধীজীর পাশেই বিবেকানন্দের ছবি। যতীন দেখিল, বিবেকানন্দের আয়ত-নয়ন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। নীচে কলরবটা বাড়িয়া উঠিল। …কিন্তু সমস্ত ছাপাইয়া গমগম করিয়া উঠিল বিবেকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠস্বর। যতীন নড়িতে পারিল না, মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতে লাগিল।

বিবেকানন্দ।

শোন বন্ধু, শোন শোন, কহিতেছি অন্তরের কথা,
আমার জীবনে আমি বুঝিয়াছি এই সত্য সার।
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ এ সমুদ্রে চারিদিকে তরঙ্গ ভীষণ,
একটি তরণী আছে, যা শুধু করিতে পারে পার।

নহে তন্ত্র, নহে মন্ত্র, নহে জপ, নহে প্রাণায়াম,
বিজ্ঞান দর্শন নহে, নহে কোন বিধান বা বিধি,
নহে ত্যাগ, নহে ভোগ, মায়া ওরা ছদ্মবেশী কাম।
ভালবাসা ভালবাসা একমাত্র ওই শ্রেষ্ঠ নিধি।

অমৃতের পুত্র তুমি, অনন্তের প্রতীক মহান
অফুরন্ত প্রেমসিন্ধু তোমারই অন্তরে উথলায়।
দাও—দাও—দাও শুধু— চাহিও না কোন প্রতিদান,
প্রতিদান চাহিলেই মহাসিন্ধু বিন্দু হয়ে যায়।

মহত্তম ব্রাহ্মণ বা ক্ষুদ্রতম কীট পরমাণু
সকলেরই মাঝে তিনি প্রেমের ঠাকুর নারায়ণ।
দেহ প্রাণ মন আত্মা দাও, বন্ধু, সর্বস্ব তোমার
তাঁহারই চরণে সব ভক্তিভরে কর সমর্পণ।

নিখিল বিশ্বের মাঝে হের তাঁর বিচিত্র প্রকাশ
এঁরে অবহেলা করি মুক্তি কোথা করিছ সন্ধান ?
উচ্চনীচনির্বিশেষে ভালবাস—শুধু ভালবাস
ওই মুক্তি, ওই মন্ত্র, ওই পূজা, ওই ভগবান।

বিবেকানন্দ থামিতে না থামিতেই দেশবন্ধুর কণ্ঠ শোনা গেল।

দেশবন্ধু। ওই যে বাঙালী কৃষক সমস্ত দিন বাঙলার মাঠে মাঠে আপনার কাজ ও আমাদের কাজ শেষ করিয়া দিবা অবসানে ঘর্মাক্ত-কলেবরে বাঙলার কুটিরে কুটিরে গান গাহিতে গাহিতে ফিরিতেছে, উহারা মুসলমান হউক শূদ্র হউক চণ্ডাল হউক উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ। অহঙ্কারী, মাথা নোয়াও। অবিশ্বাসী, তোমার প্রাণে বিশ্বাস জাগাও, জাগাও—তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ। আততায়ী, তোমার হাতের ছুরি ফেলিয়া দাও, জন্মের মত ফেলিয়া দাও—তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ। ডাক ডাক, সবাইকে ডাক। প্রাণের ডাক শুনিলে কেহ কি না আসিয়া পারে ? ওঠ, জাগ, আপনার কল্যাণকে জাগাও···

রবীন্দ্রনাথের চক্ষু হইতে বহ্নি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। শাণিত ছুরিকার মত তীক্ষ্ণ কণ্ঠ যেন অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া দিল।

রবীন্দ্রনাথ।

শতেক শতাব্দী ধ'রে নামে শিরে অসম্মান-ভার
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি দেখিবারে পাও নাকি
নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে
সবারে না যদি ডাকো এখনও সরিয়া থাকো
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতা-ভস্মে সবার সমান।

বঙ্কিমচন্দ্র। [স্মিতহাস্যসহকারে] বন্দে মাতরম্।

আলোর নীচেই ছোট একটা টেবিল ছিল। তাহার উপর একখানা বই ছিল—ব্রাদার্স কারামাজোভ। সেই পুস্তকের ভিতর হইতে একটি মূর্তি বাহির হইয়া আসিল। রুশদেশীয় কৃষকের মূর্তি। অন্তর এবং বাহিরের বহুবিধ উৎপীড়নের কাহিনী তাহার চোখের দৃষ্টিতে লেখা রহিয়াছে। যতীনের দিকে চাহিয়া সে দৃষ্টি ঈষৎ হাস্যদীপ্ত হইল।

মূর্তি। অনেক উত্থান-পতনের মধ্যে জীবন কেটেছে আমার, সাইবেরিয়ায়, জেলে, গরিবের কুঁড়েতে, চোরের আড্ডায়, ধনীর প্রাসাদে—বহু জায়গায় ঘুরেছি। বইও পড়েছি অনেক রকম; কিন্তু জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা কি লাভ করেছি জান—যার চেয়ে বড় সত্যের সাক্ষাৎ জীবনে আর পাই নি, কি তা জান ?

যতীন। না।

মূর্তি। কথাটি বাইবেলে আছে—লাভ দাই নেবার। প্রতিবেশীকে ভালবাস।

যতীন। আপনি কে ?

মূর্তি। ফিয়ডর ডস্টয়েভ্‌স্‌কি।

ডস্টয়েভ্‌স্‌কি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। দ্রুতপদে মেজ বউদি প্রবেশ করিলেন। তিনি অতিশয় উত্তেজিত।

মেজ বউদি। শুনেছ, কি কাণ্ড হয়েছে! উঃ!

যতীন। কি?

মেজ বউদি। নীলার আজ বিয়ে ছিল, জান তো? বিয়ে হচ্ছিল, এমন সময় হৈ-হৈ ক'রে একদল গুণ্ডা তাদের বাড়িতে ঢুকে প্রবালকে মেরে ফেলেছে, যোগেন পুরুতকেও মেরে ফেলেছে— নীলাকে পিঁড়ে থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের ভলান্টিয়াররা রীতিমত লড়াই ক'রে কেড়ে নিয়ে এসেছে তাকে। দুজন ভলান্টিয়ার—ছকু বীরেন লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছ।

যতীন। সে কি! নীলা কোথায় এখন?

মেজ বউদি। মোটরে ক'রে আমাদের বাড়িতেই তাকে দিয়ে গেল যে। মোটরের শব্দ শুনতে পেলে না? নীচে শুইয়ে দিয়েছি তাকে। একটি কথা কইছে না, ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে আছে খালি।

যতীন কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল।

যতান। বড়দা-মেজদার কোনও খবর এসেছে?

মেজ বউদি। হ্যাঁ, ওই ভলান্টিয়াররাই ব'লে গেল। তাঁদের কোনও বিপদ এখনও হয় নি, তবে তাঁরা এখনও ওই ভিড়ের মধ্যেই আছেন। ওঁরা কখন যে ফিরবেন! ভাল লাগে না বাপু আমার এ সব।

যতীন। বড় বউদি কি করছেন?

মেজ বউদি। তিনি রান্নাঘর থেকে এই তো বেরুলেন। নীলাকে একটু গরম দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছেন।

যতীন। চলুন, দেখি গিয়ে।

মেজ বউদি। না, তুমি যেও না। বড়দি তোমাকে যেতে মানা করলেন এখন।

এত দুঃখের মধ্যেও মেজ বউদির মুখে বউদি-সুলভ ব্যঙ্গের মৃদু হাসির ঝিলিক একবার দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল।

মেজ বউদি। বড়দি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি খাবে এখন? রান্না হয়ে গেছে।

যতীন। না, খাব না। সেজদা পুজোর ঘর থেকে বেরোন নি এখনও?

মেজ বউদি। না। আমি জানলার ফাঁক দিয়ে দেখেছিলাম একটু আগে। চোখ বুজে নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে—মনে হয় বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

যতীন। সেজ বউদি?

মেজ বউদি। বীণাও তেমনই আপাদমস্তক মুড়ে শুয়ে আছে। ওঠাতেও সাহস হচ্ছে না। বুঝতে পেরে গেছে বোধ হয়। মায়ের প্রাণ তো!···ভাল লাগে না বাপু এ সব। [কেমন যেন অন্যমনস্ক অস্থির হইয়া পড়িলেন] তুমি তা হ'লে খাবে না? আমি যাই তা হ'লে।

চলিয়া গেলেন। যতীন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আলমারির অন্ধকার কোণ হইতে অশরীরী একটি মূর্তি বাহির হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। দেখিলে মনে হয় রাজপুত।

যতীন। কে আপনি?

অশরীরী মূর্তি। আমি একজন মুসলমান নেতা।

যতীন। মুসলমান নেতা?

অশরীরী মূর্তি। হ্যাঁ। তুমি যা ভাবছ, তার জবাব দিতে এসেছি। [দাঁতে দাঁত চাপিয়া নিরুদ্ধ আক্রোশে] মুষ্টিমেয় ব'লে ভয় পাবার লোক নই আমরা। মনে নেই, গজনীর মামুদ মাত্র এক হাজার সৈন্য নিয়ে এসে কি কাণ্ড করেছিল?

যতীন। [হাসিয়া] এখন আর সেদিন নেই জনাব। এখন ভারতবর্ষের এক প্রান্তের খবর আর এক প্রান্তে নিমেষে পৌঁছয়। দরকার হ'লে এক প্রান্ত থেকে হাজার হাজার লোক উড়ে চ'লে যাবে আর-এক প্রান্তে এক ঘণ্টার মধ্যে। তা ছাড়া গজনীর মামুদের নজির দেখিয়ে তুমি আস্ফালন করছ কেন মিঞা সাহেব? তার সঙ্গে তোমার রক্তের তো সম্পর্ক নেই কোনও, রক্তের সম্পর্ক আছে বরং আমাদেরই সঙ্গে। নোয়াখালিতে আজ তোমরা যেমন অসহায় লোকদের জোর ক'রে মুসলমান করছ, ওই গজনীর মামুদরা তেমনই এককালে ভয় কিংবা লোভ দেখিয়ে তোমাদের বাপ-দাদাদের মুসলমান করেছিল। (তোমরাও তো এ দেশেরই লোক ভাই। তোমাদের সঙ্গে আমাদের এইটুকু মাত্র তফাৎ, গজনীর মামুদেরা তোমাদের মুসলমান করতে পেরেছিল, আমাদের পারে নি। তোমরা যদি আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসতে চাও, আমরা রাজি আছি। না যদি আসতে চাও, তাতেও আপত্তি নেই—যেমন আছ তেমনই থাক— মুসলমান ধর্মও ভাল ধর্ম, কোনও ধর্মই খারাপ নয়। তবে আস্ফালন ক'রো না। ওটা হাস্যকর…)

হঠাৎ হা-হা করিয়া কে যেন হাসিয়া উঠিল। তাহার পর আলমারির আর এক দিক হইতে বাহির হইয়া আসিল পাগল নজরুল ইসলাম।

নজরুল। "হিন্দু না ওরা মুসলিম?"—ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন
কাণ্ডারী, বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!
দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

ইহারা দুইজন অদৃশ্য হইবার পর আর একটি তৃতীয় মূর্তি আবির্ভূত হইল। কুড়ি বৎসরের ছেলে একটি। চোখে নির্ভীক দৃষ্টি।

যতীন। আপনি কে?

ছেলেটি। আমার নাম বিভূতিভূষণ সরকার। আমি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বোমা দিয়ে ছোট লাটের গাড়ি ওড়াবার চেষ্টা করেছিলাম। কেন জান? তার কিছুদিন আগে জামালপুরের মেলায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়। সে দাঙ্গায় রাজপুরুষরা মুসলমানদের সাহায্য করেছিলেন। এই ইংরেজদের তাড়াতে না পারলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন হবে না।

বিভূতি সরকার অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা দৃশ্য মূর্ত হইল,—একটা সাপুড়ে সাপ খেলাইতেছে। সাপুড়ের মুখটা মিস্টার চার্চিলের মুখের মত।...এ দৃশ্যও অন্তর্হিত হইল। যতীন দেখিল, দেওয়ালে অসংখ্য পোকা আসিয়াছে, টিকটিকি উন্মাদের মত পোকা শিকার করিতেছে। টিকটিকিনী সন্তর্পণে ওদিকের কোণ হইতে মুখ বাড়াইল, কিন্তু টিকটিকির সে দিকে চাহিবার অবসর নাই... সে ক্রমাগত খাইয়া চলিয়াছে। সহসা একটা গম্ভীর উদাত্ত ধ্বনি শূন্যে ভাসিয়া আসিল।

কেমনে ভুলিলে
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে।
হে রাঘব-কুল-চূড়া, তব কুলবধূ
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয়? না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন— বীর-বীর্যে সর্বভূক সম
দুর্বার সংগ্রামে তুমি—উঠ ভীমবাহু...

আবৃত্তি করিতে করিতে মাইকেল মধুসূদন প্রবেশ করিলেন। পিছনের দিকে দুই হস্ত নিবদ্ধ। আপনমনে আসিলেন এবং চলিয়া গেলেন, কোনদিকে ফিরিয়া চাহিলেন না।...সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। পাড়ার একজন ভলান্টিয়ার—অশোক, দ্রুতপদে আসিয়া প্রবেশ করিল।

তাহার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত। কপালটা কাটিয়া গিয়াছে। মুখের হাসি কিন্তু ম্লান হয় নাই, চোখের দৃষ্টি নির্ভীক। বয়স বেশি নয়, কিশোর।

অশোক। আপনার কাছে টিঞ্চার আইডিন আছে যতীনদা?

যতীন। ইস্, কি হ'ল?

অশোক। অন্ধকারে বোঁ ক'রে একটা ঢিল এসে লেগে গেল। হয়তো আমাদেরই কেউ ছুঁড়েছে। [হাসিল]

যতীন আলমারি হইতে তুলা ও টিঞ্চার আইয়োডিন বাহির করিয়া অশোকের কপালে লাগাইয়া দিতে লাগিল। অশোক অবিচলিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যতীন। বড়দা-মেজদার খবর জান?

অশোক। বড়দার ডান হাতে চোট লেগেছে। মেজদা তাঁকে নিয়ে হাসপাতালে গেলেন। উঃ, বড়দা মেজদা দুজনেই কি লড়াটাই লড়েছেন! ওঁরা না থাকলে নীলাদিকে ঠিক নিয়ে চ'লে যেত।

যতীন। বড়দার হাতের চোট খুব বেশি নাকি?

অশোক। না, খুব বেশি নয়। বড় জোর ফ্র্যাকচার হতে পারে, আবার কি হবে!

বড়দার হাতের আঘাতটা যে কিছুই নয়, এই ভাব প্রকাশ করিয়া ভুরু নামাইয়া অশোক তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল। যতীন তুলা ও একটা রুমাল দিয়া তাহার মাথাটা বাঁধিয়া দিল।

যতীন। এইবার শুয়ে পড় গিয়ে।

অশোক। [বিস্মিত] শোব কি! ওই মোড়ে আমার ডিউটি রয়েছে এখন। আর একটা খবর শুনেছেন যতীনদা, ভারি মজার

খবর। শৈলেনবাবুকেও ওরা খুন করেছে। আমি চলি যতীনদা, মোড়ে কেউ নেই।

ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। যতীন যেন কিরণমালার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল··· বহুদূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে।

কিরণমালা। [বহুদূর হইতে] মায়াপাহাড়ের রহস্য ভেদ করেছি। আসছি আমি—আসছি—

যতীন উৎসুক নয়নে দ্বারের দিকে চাহিল। কিরণমালা আসিল না, বড় বউদি প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একটা থালা। থালার উপর একটা বাটি।

বড় বউদি। তোমার খাবার দিয়ে গেলাম। আমি হাসপাতালে যাচ্ছি।

যতীন। হাসপাতালে কেন?

বড় বউদি। তোমার দাদাদের খাইয়ে আসি। তোমার বড়দাকে খাইয়েই দিতে হবে বোধ হয়। ডান হাত ভেঙেছে শুনছি। [হাসিলেন]

যতীন। ওঁরা আসবেন না হাসপাতাল থেকে?

বড় বউদি। রামদীন এসে বললে, ডাক্তারেরা রাতটা ওইখানেই থাকতে বলেছে।

যতীন। মোটর তো খারাপ, তুমি যাবে কি ক'রে? ভাড়া-গাড়িও তো পাওয়া যাবে না এখন।

বড় বউদি। রামদীনকে সঙ্গে ক'রে হেঁটেই চ'লে যাব। কতটুকুই বা!

যতীন। চল, আমিই না হয় যাই তোমার সঙ্গে।

বড় বউদি। না না, তুমি বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেও না।

তোমাকে এখান থেকে এক পা নড়তে মানা ক'রে গেছেন। তোমাকে যদি হাসপাতালে দেখেন, বাঁ হাত দিয়েই হয়তো গুলি ক'রে বসবেন। [হাসিয়া] চেন তো মানুষটিকে! দরকার নেই তোমার গিয়ে। দু-চারটে গুণ্ডা শুনছি নীলার সন্ধানে ঘুরছে এখনও। তুমি থাক বাড়িতে। রামদীন আমার সঙ্গে থাকবে, কিছু ভয় নেই। রুমি নোয়াখালি দৌড়তে পারল, আর আমি এটুকু যেতে পারব না! নীলা ঘুমুচ্ছে—তুমি এখন নীচে যেও না যেন, মেজ বউ রইল তার কাছে। বৈঠকখানার ছাতে বাঁশের সিঁড়ি লাগিয়ে দিইয়েছি। খাবারটা এই টেবিলে রইল। গরম গরম খেয়ে নাও না বাপু, তুমি মাংসের যে যে পীস ভালবাস, তাই দিয়েছি বেছে বেছে। আচ্ছা, চললুম আমি।

চলিয়া গেলেন। যতীন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মনে হইতে লাগিল, বড় বউদি যেন তাহার মা। মেজ বউদির সঙ্গে ঠিক এই সম্পর্ক তাহার নয়। তাহাকে সে এখনও 'আপনি' বলে। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কতক্ষণ তাহার খেয়াল ছিল না। একটা শব্দ হইতে সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল—পাশের ঘরের খোলা দরজা দিয়া ছাতটা দেখা যাইতেছে—বৈঠকখানার ছাত হইতে কাঠের সিঁড়ি দিয়া কে সন্তর্পণে উপরে উঠিতেছে।

যতীন। কে?

কোনও সাড়া নাই। মূর্তিটা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়া পাশের ঘরের খোলা দরজাটার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। যতীন ত্বরিত হস্তে বন্দুকটা তুলিয়া লইল।

যতীন। কে—জবাব দাও, তা না হ'লে গুলি করব।

মূর্তি। ভাই যতীন, আমি মহীউদ্দিন।

যতীন। মহীউদ্দিন!

মহীউদ্দিন। আমায় তুমি বাঁচাও ভাই, আমার বাল্যবন্ধু তুমি।

যতীন পাশের ঘরে গিয়া আলোটা জ্বালিয়া দিল। মহীউদ্দিন দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে। ভয়ে তাহার চোখ মুখ বিবর্ণ।

যতীন। মহীউদ্দিন? তুমি! ভেতরে এস।

যতীনের বন্দুকটার দিকে মহীউদ্দিন বার বার চাহিতে লাগিল।

যতীন। ভেতরে এস।

মহীউদ্দিন। তোমার হাতে—

সে আর কথা শেষ করিতে পারিল না, বিস্ফারিত চক্ষে বন্দুকটার দিকে চাহিয়া বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

যতীন। বাইরে কেন, ভেতরে এস না!

মহীউদ্দিন। ভাই—

সহসা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

যতীন। [আগাইয়া গিয়া হাত ধরিয়া] এস—এস—

মহীউদ্দিন। [সভয়ে পিছাইয়া গেল] না—না—না—

যতীন। ও, তুমি বুঝি ভয় পাচ্ছ, আমি তোমায় ঘরে পুরে মেরে ফেলব! সে ইচ্ছে থাকলে এতক্ষণ ফেলতাম। আশ্রিতকে রক্ষা করাই আমাদের ধর্ম যে ভাই। শুধু আমাদের ধর্ম নয়, তোমাদেরও

ধর্ম। আমাদের যুদ্ধ গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়, ভুল ক'রো না। এস, ভেতরে এস, ব'স।

মহীউদ্দিন তবু দাঁড়াইয়া রহিল।

যতীন। আচ্ছা, তোমার ভয় ভাঙিয়ে দিচ্ছি।

দ্বিতীয় বন্দুকটি বাহির করিয়া আনিয়া তাহার হাতে দিল।

যতীন। এই নাও, এইবার হ'ল তো? আমি যদি তোমাকে আক্রমণ করি, তুমি আত্মরক্ষা করতে পারবে। এস—ব'স।

মহীউদ্দিন ভিতরে আসিয়া বসিল।

মহীউদ্দিন। আমি খেতে বসেছিলাম, এমন সময় শুরু হয়ে গেল। উঃ—উঃ—

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

যতীন। খাবে কিছু? খাবার আছে।

পোলাও মাংস আনিয়া তাহার সামনে ধরিয়া দিল।

যতীন। খাও, খেয়ে খিল দিয়ে শুয়ে পড় তাড়াতাড়ি। কেউ যদি এসে দেখে ফেলে তোমাকে, তা হ'লে একটু মুশকিলে প'ড়ে যাব—বুঝতেই পারছ। আমি বিছানা দিচ্ছি—বেশ ক'রে খেয়ে দেয়ে শুয়ে থাক, কোন ভয় নেই। বিছানাটা পাতি, থাম।

যতীন বিছানা পাতিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। মহীউদ্দিন নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া কেবল জল পড়িতেছিল। সহসা উঠিয়া সে আবেগভরে যতীনকে আলিঙ্গন করিল। তাহার মুখ হইতে অস্ফুটকণ্ঠে বাহির হইল—ভাই!

…অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। মহীউদ্দিন পাশের ঘরে খিল দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যতীন একটা ঈজি-চেয়ারে ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে। তাহার মন ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতের আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছিল—যে ভারতে দারিদ্র্য নাই, নীচতা নাই, হিংসা নাই, দ্বন্দ্ব নাই, যাহা বহু শতাব্দীর পঙ্ককে অতিক্রম করিয়া রূপে রসে গন্ধে শতদল পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে… যে ভারতে মানুষ কামনা করে, ধন নয়, মান নয়—আনন্দ… আনন্দ আর শান্তি। …দ্বারপথে একটা শব্দ হইতেই যতীন চোখ খুলিয়া দেখিল, নীলা দাঁড়াইয়া আছে। কপালে কনে-চন্দন, পরনে চেলী।

নীলা। আমি আবার ফিরে এলুম যতীনদা।

ধীরে ধীরে সে ঘরে প্রবেশ করিল এবং যতীনের পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা গুঞ্জনরবে চতুর্দিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। যতীন দেখিল, অশরীরী ভ্রমরটা মনের আনন্দে গুনগুন করিয়া বেড়াইতেছে।

অশরীরী ভ্রমর। একটা সুখবর তোমায় দিতে এলাম—আমি তার দেখা পেয়েছি!

যতীন কোন উত্তর দিল না। নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল শুধু।

শেষ